রবীন্দ্র রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

বিশ্বভারতী

২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

উৎসর্গ

বিজয়ার করকমলে

তৃতীয়া

পূরবী

পূরবী

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা ; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি ;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশ্বাস-বায়ু।
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে ;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুরে ;
অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

বিজয়ী

তখন তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর, রক্ত-ধূলির পথবিপথে।
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন ক্লান্ত বায়ে;
বিহঙ্গ-গান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষছায়ে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে,—
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে;
দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার 'পরে।
ভাবল পথিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।

ভাবল তা'রা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তা'রা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রানীর দুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

ঐ বাজে রে ঘণ্টা বাজে।
চমকে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে।
আপনাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেশে;
মহেশ্বরের বিশ্ব যেন লুঠ করেছে অট্ট হেসে।

শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে ;
মশাল-ভস্ম লুপ্তি-ধুলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত খেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগত পুলক কী মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হত কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে ;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-খেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা-রঙিন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠত দুলে
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—

সেদিন আমার হত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি।

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে-জননীর কোলের 'পরে
জন্মেছিলি মর্ত-ঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে !
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
"গেছিস দূরে, অনেক দূরে,"
কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে ;

ফিরেছি তাই নানামতে
নানান হাটে, নানান পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণদেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
প্রভাতরবির শঙ্খ বাজে;
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা,
আবর্জনা জমে উপার্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরান কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলকধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে;
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তি-সুখে,
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে,
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।
যে-দূতগুলি গগনপারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

২৩ ফাল্গুন, ১৩২৮

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে-লেখা লিপিখানি
হাতে করে আনি',
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি ;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কালবৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।
জন্ম-মরণের
দিগ্বলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলাল।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরি হতে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে।
আলোকের অসীম সংগীতে
চিত্ত মোর ঝংকারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে

উদয় দিক্প্রান্ত-তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নবমল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন হিল্লোল-দোল-ছন্দে,
শ্যামলের বুকে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে।

সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন ;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হ'ক তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।

হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হ'ক কুজ্ঝটিকা করি' উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি,
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হ'ক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হ'ক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে
মোর চিত্তমাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

২৫ বৈশাখ, ১৩২৯

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সংগীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,

করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী 'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সংগীত ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা? বন্ধুমিলনের দিনে বারংবার।
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে, হায়,

জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে-গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ন মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া 'পরে করি' ভর,

না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসন্তপ্রভাতে ;
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে।

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব হ'ক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখ
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে-বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হ'ক এ কামনা।

আষাঢ়, ১৩২৯

শিলঙের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী কল্যাণীয়াসু

ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে,
ভাবছি বসে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।
তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস,
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস,
কিছু না হ'ক 'লঙ্‌ফেলো'দের হব আমি সমান তো,
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।
যা হ'ক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে,
শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
তাই বসেছি ডেস্কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,
"কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও, ধাঁ করকে
ভাবছি যদি তোমরা দুজন বছর তিরিশ পূর্বেতে
গরজ ক'রে আসতে কাছে, কিছু তবু সুর পেতে।
সেদিন যখন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
বর্তমানের সুবুদ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক,
তখন যদি বলতে আমায় লিখতে পয়ার মিল করে,
লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল-পিল ক'রে।
পঞ্জিকাটা মান না কি, দিন দেখাটায় লক্ষ্য নেই?
লগ্নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছ অক্ষণেই।
যা হ'ক তবু যা পারি তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে,
কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে।

শিলংগিরির বর্ণনা চাও ?   আচ্ছা না হয় তাই হবে,
উচ্চদরের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে,—
মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাত্রা দেবার বিধান তো ;
তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার নিতান্ত।

গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে,
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে
ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, "কোলে আমার শরণ নে।
ঝরনা ঝরে কলকলিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
নিঃশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে
দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত ;
মোদের 'পরে বাদল মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয় ;
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিষ দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠাণ্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন গিরিদেবের পাণ্ডাটি।
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শস্য-খেতের থাক কাটা

ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে।
নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচকাওয়াজের কাণ্ডটা,
তা ছাড়া ঐ ব্যাগপাইপ নামক বাদ্যভাণ্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সরগরম,
গুলিগোলার ধড়ধড়ানি, বুকের মধ্যে থরথরম।
আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া।
তা ছাড়া সব পিসু মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি,
কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় পিত্তাদি;
এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিংবা অর্ধটা
যৎসামান্য উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফর্দটা।
দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে;
মোটের উপর শিলঙ ভালোই যাই না বলুক নিন্দুকে।
আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।
বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।

ছড়া কিংবা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে।
তথাপি এই ছন্দ রচে করেছি কাল নষ্ট তো;
এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখি স্পষ্টত,—
তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি,
আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি
তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে.
আমাকে যে ভয় কর নি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত,

এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হল আজো আছে কম বয়সের রঙ্গিমা
জরার কোপে দাড়ি গোঁপে হয় নি জবড়জঙ্গিমা।
তাই বুঝি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
এক বয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিঃশ্বাসে।
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা "খাবার এল" আমার কি তার হুঁশ আছে?
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।
মনকে ডাকি, "হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব,
ছোট্টো দুটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব।"

জিৎভূমি, শিলং
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

যাত্রা

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল; তারা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে; শুধু বলে, "চলো চলো।"
অশ্রুবাষ্প-কুহেলিতে দিগন্তের চক্ষু ছলছল,
ধরিত্রীর আর্দ্রবক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে,
তবু ওই প্রভাতের যাত্রিদল বিদায়ের দ্বারে
হাস্যমুখে ঊর্ধ্বপানে চায়, দেখে অরুণ আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংসশুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে।

ওরে, এতক্ষণে বুঝি
তারা ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি
গেছে সাত ভাই চম্পা; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ; দিগ্বধূর বেণুতে বেণুতে

বেজেছে ছুটির গান ; ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি
মুক্তির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে ঊর্ধ্বে বাহু তুলি'
উচ্ছলিয়া বলে, "চলো, চলো।" বাউল উত্তরে-হাওয়া
ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুদ্রনেশা-পাওয়া ;
বাজায় অশান্ত ছন্দে তাল পল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র ; স্পর্শে তার হয়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তারা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে—বলে, "বৃন্তবন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘ সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব, যেথা শংকরের টলমল চরণ পাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।"
ওরা ডেকে বলে, "কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনাসভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য ; যেথায় নিঃশব্দ বেণু 'পরে
সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে।"

কবি বলে, "যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যূষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর-বরমাল্য সাথে ; দলে দলে

যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।
আমি তব সাথি,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণ বাণীর হোমানলে।"

৫ আশ্বিন, ১৩৩০

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি?

আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি।
দস্যু তারা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি।

গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন-রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্যরভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে,
উত্তরের মুখে।

তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।

সে-মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে-মন্ত্রে নবীনপত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান ;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
শুনিলে তন্ময়।

সেদিন ঐশ্বর্য তব
উন্মেষিল নব নব
অন্তরে উদ্বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে-নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে-নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধ'রে।

ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।

দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা ?
মুছিলে, চুম্বনরাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে ?
অগীত সংগীতধার,
অশ্রুর সঞ্চয়ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে ?

তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি ?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিঃশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি ?

নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।

আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
"নাহি রে, নাহি রে।"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহমাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।

তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।

ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।

হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।

সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গিদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি,
প্রাতঃসূর্যরুচি।

অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে,

ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে ;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কার্তিক, ১৩৩০

ভাঙা মন্দির

১

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজাল
পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে,
যাত্রীরা তব বিস্মৃত-পরিচয়।
সম্মুখপানে দেখো দেখি চেয়ে,
ফাল্গুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে
বনফুলদল ঐ এল ধেয়ে
উল্লাসে চারিধারে।
দক্ষিণ বায়ে কোন্ আহ্বান
শূন্যে জাগায় বন্দনাগান,
কী খেয়াতরীর পায় সন্ধান
আসে পৃথ্বীর পারে ?
গন্ধের থালি বর্ণের ডালি
আনে নির্জন অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
বকুল শিমুল আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গনে
পূজা-তরঙ্গ দুলে অম্বরময়।

২

প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ,
বেদীতে না হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
না হয় ধুলায় হল লুণ্ঠিত
আছিল যে-চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয় ?
বাহিরে তোমার ঐ দেখো ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি,
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি
প্রাচীন তোমার গেহে।
সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে
ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

৩

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে
যত সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
নাই মুখরিল পার্বণ-ক্ষণ
ঘন জনতার গর্জনে,
অতিথি-ভোগের না রহিল সঞ্চয়।

পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্ত পরানে করিছে কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎসতীরে।
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে,—
প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়॥

মাঘ, ১৩৩০

আগমনী

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পার তুমি?
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, "আহা, আহা,"
সকল বনভূমি?
শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা,
হিমের বায়ে কাঁপন-ধরা
শিথিল মন্থর;
"কে এল" বলি তরাসি উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।

ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন-হাওয়া বাহি
অশোক-বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছ কি ?"
মর্মরিয়া থরথর কাঁপিল আমলকী ।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে
"শোনো গো, শোনো শোনো ।"
শ্যামা না জানে প্রভাতী-গানে কী নামে তারে ডাকে
আছে কি নাম কোনো ?
কোকিল শুধু মুহুর্মুহু
আপন মনে কুহরে কুহু
ব্যথায় ভরা বাণী ।
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, "জানি কি, তারে জানি ?"

আমের বোলে কী কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি'
অসহ উচ্ছ্বাসে ।
আপন মনে মাধবী ভনে কেবলি দিবারাতি,
"মোরে সে ভালোবাসে ।"
অধীর হাওয়া নদীর পারে
খ্যাপার মতো কহিছে কারে
"বলো তো কী-যে করি ?"
শিহরি উঠি শিরীষ বলে, "কে ডাকে মরি, মরি ।"

কেন যে আজি উঠিল বাজি আকাশ-কাঁদা বাঁশি
জানিস তাহা না কি ?
রঙিন যত মেঘের মতো কী যায় মনে ভাসি
কেন যে থাকি থাকি ?

অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি ;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে তাই তো লাগে ধাঁধা।

পুলকে-কাঁপা কনকচাঁপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে দ্বার নাড়া,
এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে
দিয়েছে তারি সাড়া।
সহসা বনমল্লিকা যে
পেয়েছে তারে আপন মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
"এই যে তুমি, এই যে তুমি" আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব
আপন মাঝখানে,
তাই এ শীতে জাগাল গীতে বিপুল কলরব
দ্বিধাবিহীন তানে।
ওদের সাথে জাগ্‌রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্‌ সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর।
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক না ভরে ভোরের নব রবি,
বাজ্‌রে বীণা বাজ্‌।
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্‌রে দুলে কবি,
ফুরাল তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি॥

মাঘ, ১৩৩০

উৎসবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে-ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাস-কল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।

নবীন পল্লবপুটে মর্মরি মর্মরি উঠে
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস ;
উষার সীমন্তে লেখা উদয়-সিন্দুর-রেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।
আম্রের মুকুল-গন্ধে ব্যাকুল কী সুর
অরণ্যছায়ার হিয়া করিছে বিধুর ;
অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।
আশার লাবণ্যে-ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা,
হেসেছিল প্রভাত-গগন।
কত না উৎসুক-বুকে পথপানে ধাওয়া,
কত না চকিত-চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারেবারে বসন্তেরে করেছিল চাঞ্চল্যে-মগন,
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।

আজ উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে ;
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায়, কী মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ।
তাদের চমক লাগে চম্পকশাখায়,
কাঁপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাখায়,
সেতারের তারে তারে মূর্ছনায় তাদের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকূলে আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে।
বাঁশি কেন রহি রহি সে-আহ্বান আনে বহি'
আজি এই উল্লাসের গানে ?
চঞ্চলেরে শুনাইছে স্তব্ধতার ভাষা,
যার রাত্রি-নীড়ে আসে যত শঙ্কা আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে ?"

যায় যাক, যায় যাক্, আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল ;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

ফাল্গুন, ১৩৩০

গানের সাজি

গানের সাজি এনেছি আজি
ঢাকাটি তার লও গো খুলে
দেখো তো চেয়ে কী আছে।
যে থাকে মনে স্বপন-বনে
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
সে বুঝি কিছু দিয়াছে।
কী যে সে তাহা আমি কি জানি,
ভাষায় চাপা কোন্ সে বাণী
সুরের ফুলে গন্ধখানি
ছন্দে বাঁধি গিয়াছে,
সে ফুল বুঝি হয়েছে পুঁজি,
দেখো তো চেয়ে কী আছে।

দেখো তো, সখী দিয়েছে ও কি
সুখের কাঁদা দুখের হাসি,
দুরাশাভরা চাহনি ?
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান গাহনি ?
বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা,
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
আপন মনে আগুন-খেলা
পরানমন-দাহনি,—
দেখো তো ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা
আছে আকুল চাহনি ?

ডেকেছ কবে মধুর রবে
মিটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা
তোমার করপরশে,
সহসা এসে করুণ হেসে
কখন চোখে ঢালিলে সুধা
ক্ষণিক তব দরশে,—
বাসনা জাগে নিভৃতে চিতে
সে-সব দান ফিরায়ে দিতে
আমার দিনশেষের গীতে ;
সফল তারে করো সে।
গানের সাজি খোলো গো আজি
করুণ করপরশে।

রসে বিলীন সে-সব দিন
ভরেছে আজি বরণডালা
চরম তব বরণে।
সুরের ডোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাখিয়া যাব চরণে।
একদা তব মনে না রবে,
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে ঝরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল শেষ বরণে॥

ফাল্গুন, ১৩৩০

লীলাসঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝংকারে।

ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে,
কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

নদী-কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগন-কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ-বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে?
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,
অযাত্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি ?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি ?
বিবাগি মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি ?

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্তার পারে ?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তারে ?

দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণী !
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

ফাল্গুন, ১৩৩০

শেষ অর্ঘ্য

যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষবেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

বেঠিক পথের পথিক

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশথ-পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

অচিন বেদন আমার ভাষায়
মিশায় যখন রে
আপন গানের গভীর নেশায়
মন কেমন করে।
তরল চোখের তিমির তারায়
যখন আমার পরান হারায়,
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্বপন যে।
কী চাই, কী চাই, সুর যে না পাই
মনের মতন রে।

হেলায় খেলায় কোন্ অবেলায়
হঠাৎ মিলন রে।
সুখের দুখের দুয়ের মেলায়
মন কেমন করে।
বঁধুর বাহুর মধুর পরশ
কান্নায় জাগায় মায়ার হরষ,

তাহার মাঝার সেই অচেনার
চপল স্বপন যে,
কী চাই, কী চাই, বাঁধন না পাই
মনের মতন রে।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে।
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন কেমন করে।
চরণে তাহার পরান বুলাই
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই ;
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্বপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

বকুল-বনের পাখি

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি ?
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি,
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি ?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম ?

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে-কথা কি ?

বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।
সহজ রসের ঝরনা-ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি ?
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন্ সুখে
সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে-তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি ?
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি ?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি ?
কিছু কি থাকে না বাকি ?
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে ?

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
আর বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি ?
যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,
ধরার খুশিতে আছে সে সকল খানে ;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখি।

আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,
বিদায়ের আগে লও গো আপন ক'রে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
সেদিন চিনেছ আজিও চিনিবে না কি ?
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
সুরের সুরার সাকী।
আর কিছু নই, তোমারি গানের সাথি,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্তি যাক না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি'।
বেণুপল্লব-মর্মর-রব সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলি-খনে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক্ ফুটি।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে-পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে-চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে-চুম্বন লেগে
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত।

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে-বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি তম,
সে-বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবনহিল্লোল ॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী ;
আয়ুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে ?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত-প্রাণে ?
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা।
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হ'ক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা,
না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ-বর্ষণে ;
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপলঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়;
সঙ্গে যেন থাকে।

তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী,
লয়ে তার ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি ?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হ'ক; ধৌত হ'ক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দূর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

হারুনা-মারু জাহাজ
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

পূর্ণতা

১

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—
"তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হতে করিবে হরণ,—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধ শোক
মরণের অধিক মরণ॥"

২

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি
বলেছিনু তোরে কানে কানে,-
"তুই যদি যাস দূরে
তোরি স্থরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে

ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার,—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার॥"

৩

দুজনের সেই বাণী
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা ;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।

একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন ॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
১ অক্টোবর, ১৯২৪

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে ॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হতে অকস্মাৎ কর মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে ॥

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি,
বাঁচি, আমি বাঁচি।

তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্য-কলরোলে ॥

নিঃশব্দচরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্তহস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে ॥

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে ॥

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্রপুষ্পভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বদ্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি

রহস্য সমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি ॥

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকৃতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু-বাহু বাড়ালে ॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে ॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস ॥

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান ?
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে ?
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ, রমণী,
নীরব নিশীথে ?

মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি,
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কালবৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে॥

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি ; দিগন্ত অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্বশেষ ক্ষতি ;
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি॥

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী ?
দক্ষিণ-পবন

বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি' ;
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার॥

জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনী ?
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র-গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে ?
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
১ অক্টোবর, ১৯২৪

ছবি

শুভ্র চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে
তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
আলোক-চুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ।
ঊর্ধ্বে যায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখা।
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে,
নিঃসংকোচে হাসে।
বহে মন্দ মন্থর বাতাস
সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্য-নিঃশ্বাস।
স্বর্গসুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে,
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে॥

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্ত যায় রবি;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ
২ অক্টোবর, ১৯২৪

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে ?
প্রত্যুষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি'
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধমনে ॥

বহুযুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে
বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথমে পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।
নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রধ্বনি
উচ্ছ্বসিল পর্বতের শিখরে শিখরে।
কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে
জয়, জয়, জয়।
ঝঞ্ঝা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়
"জাগো রে, জাগো রে,"
বনে বনান্তরে ॥

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।

তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি
উর্ধ্বে চেয়ে কয়—
জয়, জয়, জয়।
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয়;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়,—
জয়, জয়, জয়॥

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান;
উর্ধ্ব হতে তাই নামে গান।
চিরবিরহের নীল পত্রখানি 'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তারে রাখ,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাক;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,—
মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী কর তারে;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখ তারে ভরি;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল পল্লবে মর্মরি,
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে॥

বিরহিণী, সে-লিপির যে-উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।

যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেল ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে ;
অবশেষে একদিন জলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।
তার পরে আর বার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখ নূতন ভাষায়।
যুগযুগান্তর চলে যায় ॥

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে
বসে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।
শরতে দিগন্ততলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সংগীতে তারি পড়ুক নিঃশ্বাস।
অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
কটিতটে যে কলকিঙ্কিণী,
মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিঝিনি,
ওগো বিরহিণী ॥

দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা,
তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হ'ক জ্বালাময়ী॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৪ অক্টোবর, ১৯২৪

ক্ষণিকা

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,-
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥

ভেবেছিনু গেছি ভুলে; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি॥

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল ; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী ॥

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন ॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরমলগ্নে, সখী
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি ॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান ;—
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি বুঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি ?
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান ?
কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান ॥

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে

সংশয়-মোহের নেশা ;—সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে॥

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা ;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৬ অক্টোবর, ১৯২৪

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথি!
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙিন শিখার বাতি।
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি?
উদয়-ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি॥

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে?

বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
শুকনো পাতার তলে ?
যে-সুর তুমি শিখিয়েছিলে বসে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে,
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল চোখের জলে,—
কাঁপত যে-সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুকনো পাতার তলে ॥

মোর প্রভাতের খেলার সাথি আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আজি
একি পথের ভুলে ?
বকুলবীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে ?
সেই সাজি তার দখিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ দুলে।
সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে
এ কি পথের ভুলে ॥

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু,
তেমনি হবে সারা।
সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব খ্যাপার দলে তেমনি আবার জুটে
করবে দিশেহারা।
স্বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
তেমনি হব সারা ॥

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হতে
তাই কি আমায় ডাক ?
সকল চিন্তা উধাও ক'রে অকারণের টানে,
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
থরথরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাক ?
না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকেরি মাঝখানে
তাই আমারে ডাক ॥

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথি ।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি ।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি ।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি ॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৭ অক্টোবর, ১৯২৪

অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা ;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা ?
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, ম্লান শীতের ক্ষণে
ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে।
সকল শেষের শিউলিটি যেই ধুলায় হবে ধূলি,
সঙ্গিনীহীন পাখি যখন গান যাবে তার ভুলি
হয়তো তুমি আপন মনে আসবে সোনার রথে
শুকনো পাতা ঝরা ফুলের পথে ॥

পুলক লেগেছিল মনে পথের নূতন বাঁকে
হঠাৎ সেদিন কোন্ মধুরের ডাকে।
দূরের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে ;
মনের ভুলে ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি এলে,
গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়া মেলে।
হয়তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা ॥

হয়তো সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে
হয়তো আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভুরু,
বক্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক দুরু দুরু
সেদিন হতে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে
রাঙিয়েছিল হয়তো ব্যথার রক্তিম কুঙ্কুমে ;
আধেক চাওয়ায় ভুলে যাওয়ায় হয়েছে জাল-বোনা,
তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা ॥

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত।
মনের মাঝে বাজল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
সেদিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী;
দখিন বাতাস ফেলেছে শ্বাস রাতের আকাশ ঘেরি
সেদিন আমি গেয়েছি গান তোমার বিরহেরি;
ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান॥

এ গানগুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি?
ক্ষতি কি তায়, নাই চিনিলে, সখী।
তবু তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়,
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয়;
যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের সুরে
বরণ করে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।
রোদন খুঁজে ফিরবে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিলবে তাহার বাণী॥

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুলবীথির ছায়াখানি মধুর মূর্ছাভরা;
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা;
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা;
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান;
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান॥

আণ্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

আনমনা

আনমনা গো, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে ?
তোমারো মন জানব না,
আনমনা গো আনমনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা
আনমনা গো আনমনা॥

জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল ;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ পানে রইবে পেতে কান,
বুকের তলে শুনবে বলে গ্রহতারার গান ;
কুলায়-ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাকি ;
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ-বিদায়ের ছবি ;
স্তব্ধ হবে দিনের বেলার ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা,
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা ;—
তখন সন্ধ্যাতারা
পায় যদি তার সাড়া
তোমার উদার আঁখিতারার পারে ;
কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল বিছানো ভুঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে ;

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আলপনা,
আনমনা গো আনমনা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল?
সে-ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে সাজিয়ে রাখাই ভুল,
মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে?
ধুলায় তারি শান্তি, তারি গতি,
এই সমাদর ক'রো তাহার প্রতি
সময় যখন গেছে, তখন তারে
ভুলো একেবারে।

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া;
বনের বক্ষ উঠেছে আজ দুলে,
চামেলি ওই কার যেন পথ-চাওয়া।
ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি,
চোখে-চোখে নীরব জানাজানি,
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ।

যদি বা তার ফুরিয়ে থাকে বেলা,
মনে জেনো দুঃখ তাহে নাই ;
করেছিল ক্ষণকালের খেলা,
পেয়েছিল ক্ষণকালের ঠাঁই ।
অলকে সে কানের কাছে দুলি
বলেছিল নীরব কথাগুলি,
গন্ধ তাহার ফিরেছে পথ ভুলে
তোমার এলোচুলে ।

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি ?
লুকিয়ে সে কি রয় নি কোনোখানে ?
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে ?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা ?
অশ্রুতে তার আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি ।

না-হয় তা-ও লুপ্ত যদিই হয়,
তার লাগি শোক, সে-ও তো সেই পথে ।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে ।
শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—
সেই ধূলারি বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে ।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

আশা

মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয় ;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময়।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে ; অনেক লেখাপড়া,
অনেক ভাষায় বকাবকি, অনেক ভাঙাগড়া।
ক্রমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের পরে গিঁঠ,
মহল পরে মহল ওঠে, ইঁটের পরে ইঁট।
কীর্তিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ,
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মসলা যেমন জোটে,
মোটের 'পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়,
সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয়।
একটুকু সুখ গানে সুরে ফুলের গন্ধে মেশা,
গাছের-ছায়ায়-স্বপ্ন-দেখা অবকাশের নেশা,
মনে ভাবি চাইলে পাব ; যখন তারে চাহি,
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি।
অরূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে,
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,

চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, খেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;—
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;—
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;—
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।

'আশা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

বাতাস

গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝতে কে বা পারে,
কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে?
বাতাস বলে, ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ;
সেই প্রভাতের আলো এল, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম
হে মোর কুসুম।

পাখি বলে, ওগো বাতাস, কী তুমি চাও বুঝিয়ে বলো মোরে,
কুলায় আমার দুলাও কেন ভোরে?
বাতাস বলে, ওগো পাখি, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি তুমি কারে খোঁজ;
সেই আকাশে জাগল আলো আমি কেবল দিনু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী।

নদী বলে, ওগো বাতাস, বুঝতে নারি কী-যে তোমার কথা,
কিসের লাগি এতই চঞ্চলতা।
বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
জানি তোমার বিলয় যেথা খোঁজ;
সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার বুকের কাছে,
তোমার ঢেউয়ের নাচে।

অরণ্য কয়, ওগো বাতাস, নাহি জানি বুঝি কি নাই বুঝি
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পূজি।
বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজ;
সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারি।

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে
বলো মোদের, কী চাও তুমি নিজে?
বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজ,—
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

লিসবন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর, ১৯২৪

স্বপ্ন

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, "ওগো সত্য সে কি?"
কী জানি গো, হয়তো বুঝি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি।
হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদিযুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু চাঁদের পথ-ভোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি।
এই কূলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে,
পরশ তোমার ছাড়িয়ে কান্না বাজে মায়ার বীণার তারে।
হয়তো-হবে সত্য তাই,
হয়তো তোমার স্বপন, আমার আপন মনের মত্ততাই।

আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে ?
যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।
সেই-তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন,
ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।
নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ, কভু হেলা।
চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

আপনি তুমি দেখেছ কি আপন মাঝে সত্য কী যে ?
দিতে যদি চাও তা কারে, দিতে কি তাই পার নিজে ?
হয়তো তারে দুঃখদিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।
অমৃত যে হয় নি মথন,
তাই তোমাতে এই অযতন ;
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা।
নিত্যকালের আপন তোমার লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে,—
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।
আমি জানি সত্য তাই,
মরণ-দুঃখে অমর জাগে, অমৃতেরি তত্ত্ব তাই।

পুষ্পমালার গ্রন্থিখানা অনাদরে পড়ুক ছিঁড়ে,
ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার ভিড়ে।
ছল করে যা পিছু ডাকে
পিছন ফিরে চাস নে তাকে,

ডাকে না যে যাবার বেলায় যাস নে তাহার পিছে পিছে।
যাওয়া-আসা-পথের ধুলায়
চপল পায়ের চিহ্নগুলায়
গনে গনে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে মিছে।
কী হবে তোর বোঝাই করে ব্যর্থ দিনের আবর্জনা;
স্বপ্ন শুধুই মর্ত্যে অমর, আর সকলি বিড়ম্বনা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে,—অসীম পথের পথ্য তাই।

লিসবন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর, ১৯২৪

সমুদ্রে

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা;
যুগযুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহাদ্বীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার
ফেনিল তোমার নীলে বিলীন দুলিছে একাকার।
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন,
জলে তব এক গান, অব্যক্তের অস্থির গর্জন।

২

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোল-মুখর মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে

চাহিলাম ; শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; দেখিলাম শূন্যমাঝে
আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময় বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি' তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ-উৎসবদিনে। যুগসন্ধ্যা কবে এল তার
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। রূপ-নিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধুলায় ধুলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল।

৩

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে ;
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা ;
বিশ্বগীতি-নির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ জন্মে ;—দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারাল তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

আণ্ডেস জাহাজ
২১ অক্টোবর, ১৯২৪

মুক্তি

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে,—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তাহলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়।

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।

সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন ;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
বিশ্বগীত-পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

সঁপি দিব সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণাতারে,—
ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচু
শুনিব তাহারে।
দেখিব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে ;
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে ;
বিবাগি ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে ;
নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়
সায়াহ্ন-গগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত ;
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

আণ্ডেস জাহাজ
২২ অক্টোবর, ১৯২৪

ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।
মুখ-ধোবার ঐ ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা,
ক্লান্ত চোখের বোঝা।
দুলছে কাপড় peg এ
বিজলি-পাখার হাওয়ার ঝাপট লেগে।
গায়ে গায়ে ঘেঁষে
জিনিসপত্র আছে কায়ক্লেশে।
বিছানাটা কৃপণ-গতিকের
অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের।
ঘরে আছে যে-কটা আসবাব
নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মুখের ভাব
নারাজ ভৃত্যসম,
পাশেই থাকে মম,
কোনোমতে করে কেবল কাজচলাগোছ সেবা।
এমন ঘরে আঠারো দিন থাকতে পারে কেবা?
কষ্ট বলে একটা দানব ছোট্টো খাঁচায় পুরে
নিয়ে চলে আমায় কত দূরে।
নীল আকাশে নীল সাগরে অসীম আছে বসে,
কী জানি কোন্ দোষে
ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোরে
সেখান হতে করেছে একঘরে।

হেনকালে ক্ষুদ্র দুখের ক্ষুদ্র ফাটল বেয়ে
কেমন করে এল হঠাৎ ধেয়ে
বিশ্বধরার বক্ষ হতে বিপুল দুখের প্রবল বন্যাধারা;
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা,
আনলে আপন বৃহৎ সান্ত্বনারে,
আনলে আপন গর্জনেতে ইন্দ্রলোকের অভয়ঘোষণারে।

মহাদেবের তপের জটা হতে
মুক্তিমন্দাকিনী এল কূল-ডোবানো স্রোতে ;
বললে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে,
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
বললে, আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান,
মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ।
মৃত্যুজয়ের ডমরুরব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাণ্ডবতাল সদাই বাজাই উদ্দাম নির্ঝরে।

স্বপ্নসম টুটে
এই কেবিনের দেওয়াল গেল ছুটে।
রোগশয্যা মম
হল উদার কৈলাসেরি শৈলশিখর সম।
আমার মনপ্রাণ
উঠল গেয়ে রুদ্রেরি জয়গান :

সুপ্তির জড়িমাঘোরে
তীরে থেকে তোরা ও'রে
করেছিস ভয়,
যে-ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জন আনে—
"নয়, নয়, নয়।"

তোরা বলেছিলি তাকে
"বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখির ডাকে
তরুর মর্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।"

ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে,—
"নয়, নয়, নয়।"

সমুদ্রে আমার তরী;
আসিয়াছি ছিন্ন করি'
তীরের আশ্রয়।
ঝড় বন্ধু তাই কানে
মাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
"জয়, জয়, জয়।"

আমি যে সে-প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস,—
তরীর পালে সে যে রে
রুদ্রেরি নিঃশ্বাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,
"আছে আছে, পার আছে,
সন্দেহ-বন্ধন ছিঁড়ি, লহ পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রান্ত,
"তুমি পান্থ, আমি পান্থ,
জয়, জয়, জয়।"

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে,
"এ দেখি প্রলয়
ঝড় বলে, "ভয় নাই,
যাহা দিতে পার, তাই
রয়, রয়, রয়।"

চলেছি সম্মুখ-পানে
চাহিব না পিছু।
ভাসিল বন্যার টানে
ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা, তাই বোঝা,
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে, "এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়।"

এ মোর যাত্রীর বাঁশি
ঝঙ্কার উদ্দাম হাসি
নিয়ে গাঁথে সুর—
বলে সে, "বাসনা অন্ধ,
নিশ্চল শৃঙ্খল-বন্ধ
দূর, দূর, দূর।"

গাহে "পশ্চাতের কীর্তি,
সম্মুখের আশা
তার মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
বাঁধিস নে বাসা।
নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর
যত লোভ, যত শঙ্কা
দাসত্বের জয়ডঙ্কা,
দূর, দূর, দূর।"

এস গো ধ্বংসের নাড়া,
পথভোলা, ঘরছাড়া,
এস গো দুর্জয়।
ঝাপটি মৃত্যুর ডানা
শূন্যে দিয়ে যাও হানা—
"নয়, নয়, নয়।"

আবেশের রসে মত্ত
আরামশয্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়,—
কার্পণ্যের বদ্ধ দ্বারে,
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
"নয়, নয়, নয়।"

আণ্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি ?
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
অজানার যাত্রী কে গো ? ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।
এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে ?
এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছু নাহি চাহে,—
নিজের খেলেনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে ?
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায় ?

হ'ক তাই
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা ;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে

বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন, শুনেছি এমনি
বারে বারে ?
একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে ?
একি মোর আপন বক্ষেতে ?
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে ?
তবে কি হবেই যেতে ?
সব বন্ধ করিবে ছেদন ?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিচ্ছেদের তীর হতে ?
তরী কি ভাসাব স্রোতে ?
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাক মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে ?
বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি ;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে ?
সূর্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কী সংকেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চলে যায় ?
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি ?

তারে কি বিরহী
বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি ?
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী

আণ্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

প্রকাশ

খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল,
সে-পথ আমায় দাও নি তুমি বলে।
বাহির-দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মধ্যে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চলে।
এই ছবি মোর ছিল মনে,—
নির্জন মন্দিরের কোণে
দিনের অবসানে
সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাতারার পানে।
নিভৃত ঘর কাহার লাগি
নিশীথ রাতে রইল জাগি,
খুলল না তার দ্বার।
হে চঞ্চলা, তুমি বুঝি
আপনিও পথ পাও নি খুঁজি,
তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে,
আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা।

কাঙাল সুরে দখিন বাতাস বনে বনে গুপ্ত কী ধন মাগে,
বেড়ায় নিদ্রাহারা।
হায় গো তুমি জান না যে
তোমার মনের তীর্থমাঝে
পূজা হয় নি আজো।
দেবতা তোমার বুভুক্ষিত, মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজ।
হল সুখের শয়ন পাতা,
কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা,
প্রমোদ-রাতের গান,
হয় নি কেবল চোখের জলে
লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে
আপনভোলা সকল-শেষের দান।

ভোলাও যখন, তখন সে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে;
ভুলবে যখন, তখন প্রকাশ পাবে,—
উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে
গভীর অনুভাবে।
ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয়কো অভিমান;
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।
আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখ-সাগরতীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।

আণ্ডেস জাহাজ
২৬ অক্টোবর, ১৯২৪

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
হয় সে অমৃতপাত্র, সীমার ফুরালে অহংকার।
শেষের দীপালি-রাত্রে, হে অশেষ
অমা-অন্ধকার-রন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

ভোরের বাতাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
তারাহারা রাত্রির বীণার
চরম ঝংকার।
যামিনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি
প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী
শেষ করে যায় তার,
উদয়সূর্যের পানে শান্ত নমস্কার।
যখন কর্মের দিন
ম্লান ক্ষীণ,
গোষ্ঠে-চলা ধেনুসম সন্ধ্যার সমীরে
চলে ধীরে আঁধারের তীরে—
তখন সোনার পাত্র হতে
কী অজস্র স্রোতে
তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্যধারায়?
যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়
বর্ষণের সকল সম্বল,
শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ্র সমুজ্জ্বল।—

হে অশেষ, তোমার অঞ্জনে
ভারমুক্ত তার সাথে ক্ষণে ক্ষণে
খেলায়ে রঙের খেলা,
ভাসায়ে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোল তার শেষ বেলা।

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত।
বধূ যথা গোধূলিতে শেষ ঘট ভ'রে,
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেই মতো, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।
হে ভীষণ, তব স্পর্শঘাত
অকস্মাৎ
মোর গূঢ় চিত্ত হতে কবে
চরম বেদনা-উৎস মুক্ত করি অগ্নিমহোৎসবে
অপূর্ণের যত দুঃখ, যত অসম্মান
উচ্ছ্বাসিত রুদ্র হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান।

আণ্ডেস জাহাজ
২৯ অক্টোবর, ১৯২৪
Equator পার হয়ে আজ দক্ষিণ মেরুর মুখে

দোসর

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি—
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলখ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।
চমকে উঠে ছুটি যে তাই বাতায়নে,
সকল কাজে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন মনে ;—
পারের পাখি আকাশে ধায় উধাও গানে
চেয়ে থাকি তাহার পানে।

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে
বসন্ত তার পুলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুল-ফোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে
গুঞ্জরিয়া মর্মরিয়া কী বলে যায় কানে কানে,
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে,
ভাসে নয়ন অশ্রুজলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন্ সুদূরে
ঘরছাড়া মোর ভাবনা বাউল বেড়ায় ঘুরে।
তারে যখন শুধাই, সে তো কয় না কথা,
নিয়ে আসে শুষ্ক গভীর নীলাম্বরের নীরবতা।
একতারা তার বাজায় কভু গুনগুনিয়ে,
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া,—
এবার তবে হ'ক আমাদের তরী বাওয়া।
দিনে দিনে পূর্ণ হল ব্যথার বোঝা,
তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা খোঁজা।
একে একে সকল রশি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকূলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও না দেখা,
সময় হল একার সাথে মিলুক একা।

নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হ'ক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

আণ্ডেস জাহাজ
২৮ অক্টোবর, ১৯২৪

অবসান

পারের ঘাটা পাঠাল তরী ছায়ার পাল তুলে,
আজি আমার প্রাণের উপকূলে।
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে—
বাঁশির সুরে ভরিয়া দাও গোধূলি-আলোটিরে।
সাঁঝের হাওয়া করুণ হ'ক দিনের অবসানে
পাড়ি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
নিভৃত খনে আপন মনে গাই।
আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে—
অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে,—
আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক পূরবীতে
একটি সংগীতে।

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব,
আমার গানে, বলো, কী আমি কব।
দিনের শেষে যে-ফুল পড়ে ঝরে
তাহারি শেষ নিঃশ্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে?
অথবা ব'সে বাঁধিব সুর যে-তারা ওঠে রাতে
তাহারি মহিমাতে।

সন্ধ্যা মম, যে-পার হতে ভাসিল মোর তরী
গাব কি আজি বিদায়গান ওরি ?
অথবা সেই অদেখা দূর পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে ?
বলিব,—যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
চলিনু খুঁজে নিতে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩০ অক্টোবর, ১৯২৪

তারা

আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই ?
ওই হবে কি ওই ?
রাঙা আভার আভাস মাঝে, সন্ধ্যারবির রাগে
সিন্ধুপারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে,
ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নামহারা,
ওই কি আমার হবে আপন তারা ?

জোয়ারভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এমনি করে পথে পথে অনেক হল খোঁজা,
এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা ;—
ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দূরে এসে তার ভাষা কি ভুলেছি কোন্‌খনে ?
পড়বে না কি মনে ?
ঘরে-ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোথায় জেলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে ?
কোন্ রাতে যে মেটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা,
খুঁজে খুঁজে পাব না তার দিশা ?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি তার নাড়া—
পাই নি কি তার সাড়া?
বাতায়নের মুক্তপথে স্বচ্ছ শরৎ-রাতে
তার আলোটি মেশে নি কি মোর স্বপনের সাথে?
হঠাৎ তারি সুরখানি কি ফাগুন-হাওয়া বেয়ে
আসে নি মোর গানের 'পরে ধেয়ে?

কানে কানে কথাটি তার অনেক সুখে দুখে
বেজেছে মোর বুকে।
মাঝে মাঝে তারি বাতাস আমার পালে এসে
নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আনমনাদের দেশে,
পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন্ মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্যহারার দলে।
বাসায় এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল মিলন-ঘন রাতে
বাঁধনহারা শ্রাবণ-ধারাপাতে।

ফিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই,
আমার তারা কই?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে;
সুর ঘুমাল নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা,
কোন্ আকাশে আমার আপন তারা?

আণ্ডেস জাহাজ
১ নভেম্বর, ১৯২৪

কৃতজ্ঞ

বলেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা ক'রো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে
চঞ্চল আলোকছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি 'পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন,
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতিমুহূর্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা ক'রো তবে।
তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ; রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে

আমারে করায় পান। ক্ষমা ক'রো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি
হৃদিমাঝে; আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে,—সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

আণ্ডেস জাহাজ
২ নভেম্বর, ১৯২৪

দুঃখ-সম্পদ

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে; অমৃতের কণা
গলে আসে অশ্রুজলে;
সে-আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।

তখন সে মহা-অন্ধকারে
অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তরমাঝারে।
তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।

আণ্ডেস জাহাজ
৪ নভেম্বর, ১৯২৪

মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে
আনন্দকল্লোলে।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাখি,
জননীর আঁখি,
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে যে গৃহমাঝে গৃহীরে আহ্বান।

মৃত্যু তোর হ'ক দূরে নিশীথে নির্জনে
হ'ক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী।
অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর,
বিদেশের বিবাগি নির্ঝর
বিদায়-গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনন্তের মন্দির-সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে

দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর, ১৯২৪

দান

কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে,
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন দুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভুলে

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে ?
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে ?
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে ?
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি ?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি কজন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্‌ খনিতে কোন্‌ ধনভাণ্ডারে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে,
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।
তাই তো বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর, ১৯২৪

সমাপন

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ;
যদি অবসান সুমধুর
আপন বীণার তারে সকল বেসুর
সুরে বেঁধে তুলে থাকে;
অস্তরবি যদি তোরে ডাকে

দিনেরে মাভৈঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায় ;
সুন্দরের শেষ অর্চনায়
আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা ;
যদি সন্ধ্যাতারা
অসীমের বাতায়নতলে
শান্তির প্রদীপশিখা দেখায় কেমন করে জ্বলে ;
যদি রাত্রি তার
খুলে দেয় নীরবের দ্বার,
নিয়ে যায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে
সকল বাণীর শেষ সাগর-সংগম তীর্থতীরে
সেই শতদল হতে যদি গন্ধ পেয়ে থাক তার
মানস-সরসে যাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার।

আণ্ডেস জাহাজ
৫ নভেম্বর, ১৯২৪

ভাবী কাল

ক্ষমা ক'রো, যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি,— মোর কাব্যখানি লয়ে করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা ;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"

হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"

আণ্ডেস জাহাজ
৬ নভেম্বর, ১৯২৪

অতীত কাল

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে;
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল;
অতীতের সূর্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে
মৃত্যুর ঐশ্বর্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল।
তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
প্রেয়সীর নিঃশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে।
যেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে,—
মিলনের রাতে।

আণ্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর, ১৯২৪

বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্তে ঘুরিতে থাকে ;—
সূর্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে ;—
ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি।
শিশু রুদ্র হাসে খল খল,
দোলে টল মল
লীলাভরে।
প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে
ওঠে পড়ে আসে যায় একান্ত হেলায়,
নিরর্থ খেলায়।
গানগুলি সেইমতো বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।

আণ্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর, ১৯২৪

শীত

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
গানের বেলা শেষ না হতে হতে ?
মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো
ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে।
মনের কথা যত
উজান তরীর মতো ;

পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণ-পারে নিয়ে চলে,
চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

ঘোরে তারা শুকনো পাতার পাকে,
কাঁপন-ভরা হিমের বায়ুভরে?
ঝরা ফুলের পাপড়ি তাদের ঢাকে,
লুটায় কেন মরা ঘাসের 'পরে?
হল কি দিন সারা?
বিদায় নেবে তারা?
এবার বুঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তারা পৌউষ-রাতে
ধুলার ডাকে সাড়া দিতে চলে
যেথায় ভূমিতলে
একলা তুমি, প্রিয়ে,
বসে আছ আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে?

মন যে বলে, নয় কথনোই নয়,
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান;
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।
শীর্ণ শীতের লতা
আমার মনের কথা
হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে
নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে,

ফাল্গুনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণমূলে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ নভেম্বর, ১৯২৪

কিশোর প্রেম

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?
সে যে অনেক দিনের কথা।

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর-পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা;
যেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে;
চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আসাযাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা,
সেই শেষ-না-করা কথা।

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রভাত

স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।
যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।
ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি;
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।
ধূলি-উৎস হতে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ,
জন্মমৃত্যু-তরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি।
রক্তে মোর উঠে বাজি
তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর,
নিখিল মর্মর।
এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন।
এই স্বচ্ছ উদার গগন
বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ শব্দহীন সুর।
আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর, ১৯২৪

বিদেশী ফুল

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
"কী তোমার নাম",
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বুকের কাছে ধরে
শুধালেম, "বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাক,"
হাসিয়া দুলালে মাথা, কহিলে, "জানি না, জানি নাকো।"
বুঝিলাম তবে
শুনিয়া কী হবে
থাক কোন্ দেশে।
যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে
তাহার হৃদয়ে তব ঠাঁই,
আর কোথা নাই।

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,
"ভাষা কী তোমার?"
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, "জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিঃশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিঃশ্বাসের ভাষা।"

হে বিদেশী ফুল, আমি যেদিন প্রথম এনু ভোরে—
শুধালেম, "চেন তুমি মোরে?"

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

হাসিয়া দুলালে মাথা, ভাবিলাম, তাহে একরতি
নাহি কারো ক্ষতি
কহিলাম, "বোঝ নি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভরেছে মোর রসে ?
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী।"

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই, "বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি ?"
হাসিয়া দুলাও মাথা ; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা ;—
মোরে ভুলিবে না।

বুয়েনোস এয়ারিস
১২ নভেম্বর, ১৯২৪

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী,—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, "তোমারে যে জানি মোরা জানি ;
আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।"

তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, "তোমারে যে জানি আমি জানি
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

বুয়েনোস এয়ারিস
১৫ নভেম্বর, ১৯২৪

অন্তর্হিতা

প্রদীপ যখন নিবেছিল,
আঁধার যখন রাতি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিল,
ছিল না কেউ সাথি।
মনে হল অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির-দ্বারে,
মনে হল শুনি যেন
পায়ের ধ্বনি কার,
রাতের হাওয়ায় বাজল বুঝি
কঙ্কণ-ঝংকার।

বারেক শুধু মনে হল
খুলি, দুয়ার খুলি।
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেনু ভুলি।
"কোন্ অতিথি দ্বারের কাছে
একলা রাতে বসে আছে?"
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধাল যবে,
বলেছিলেম, আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে।

মাঝ-গগনে সপ্ত-ঋষি
স্তব্ধ গভীর রাতে
জানলা হতে আমায় যেন
ডাকল ইশারাতে।
মনে হল, শয়ন ফেলে
দিই না কেন আলো জ্বেলে,
আলসভরে রইনু শুয়ে
হল না দীপ জ্বালা।
প্রহর পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল তালা।

জাগল কখন দখিন-হাওয়া
কাঁপল বনের হিয়া,
স্বপ্নে কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া।
যূথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল, আমার
সকল অঙ্গ চুমে।
জেগে উঠে আবার কখন
ভরল নয়ন ঘুমে।

ভোরের তারা পুব-গগনে
যখন হল গত
বিদায়রাতির একটি ফোঁটা
চোখের জলের মতো,
হঠাৎ মনে হল তবে,
যেন কাহার করুণ রবে

শিরীষ ফুলের গন্ধে আকুল
বনের বীথি ব্যেপে
শিশির-ভেজা তৃণগুলি
উঠল কেঁপে কেঁপে।

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন
খুলে দিলেম দ্বার,
হায় রে, ধুলায় বিছিয়ে গেছে
যূথীর মালা কার।
ঐ যে দূরে, নয়ন নত
বনের ছায়ায় ছায়ার মতো
মায়ার মতো মিলিয়ে গেল
অরুণ-আলোয় মিশে,
ঐ বুঝি মোর বাহির-দ্বারের
রাতের অতিথি সে।

আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার
রাখব খুলে রাতে।
প্রদীপখানি রইবে জ্বালা
বাহির-জানালাতে।
আজ হতে কার পরশ লাগি
পথ তাকিয়ে রইব জাগি;
আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেয়ে
যূথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে?

বুয়েনোস এয়ারিস
১৬ নভেম্বর, ১৯২৪

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু-হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে,
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি ?
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি
যাই না নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সে-ও,
সুধায় ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে ;
ভুলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো যেয়ো ভুলে।

বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায়, সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।
হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হল যে আমার মনে।

দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৭ নভেম্বর, ১৯২৪

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এত কাল ভুলে ছিনু তাই।

হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে ;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি',
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণা-রসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না শোন শোন,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি ;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত ক'রো ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

তার পরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দলে,
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলিরবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে।

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

বুয়েনোস এয়ারিস
২১ নভেম্বর, ১৯২৪

বিপাশা

মায়ামৃগী, নাই বা তুমি
পড়লে প্রেমের ফাঁদে
ফাগুন-রাতে চোরা মেঘে
নাই হরিল চাঁদে।
বাঁধন-কাটা ভাবনা তোমার
হাওয়ায় পাখা মেলে,
দেহমনে চঞ্চলতার
নিত্য যে ঢেউ খেলে।

২৭ নভেম্বর
বুয়েনোস এয়ারিস।

পূরবীর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকৃত লিপিচিত্রণ

ঝরনা-ধারার মতো সদাই
মুক্ত তোমার গতি,
নাই বা নিলে তটের শরণ
তায় বা কিসের ক্ষতি ?
শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি
শুভ্র আলোয় ধোওয়া,
একটুখানি অরুণ-আভার
সোনার হাসি-ছোঁওয়া ;
শূন্য পথে মনোরথে
ফের আকাশ পার,
বুকের মাঝে নাই বহিলে
অশ্রু-জলের ভার ?
এমনি করেই যাও খেলে যাও
অকারণের খেলা ;
ছুটির স্রোতে যাক না ভেসে
হালকা খুশির ভেলা।
পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন
নামবে আঁখির পাতে,
কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
দূরের দুরাশাতে ;
তোমার পায়ের নূপুরখানি
বাজাক নিত্যকাল
অশোকবনের চিকন পাতার
চমক-আলোর তাল।
রাতের গায়ে পুলক দিয়ে
জোনাক যেমন জ্বলে
তেমনি তোমার খেয়ালগুলি
উড়ুক স্বপনতলে।
যারা তোমার সঙ্গ-কাঙাল
বাইরে বেড়ায় ঘুরে,

ভিড় যেন না করে তোমার
মনের অন্তঃপুরে।
সরোবরের পদ্ম তুমি,
আপন চারিদিকে
মেলে রেখো তরল জলের
সরল বিস্ময়টিকে।
গন্ধ তোমার হ'ক না সবার,
মনে রেখো তবু
বৃন্ত যেন চুরির ছুরি
নাগাল না পায় কভু।
আমার কথা শুধাও যদি—
চাবার তরেই চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার
ভাবনা কিছুই নাই।
তোমার পানে নিবিড় টানের
বেদন-ভরা সুখ
মনকে আমার রাখে যেন
নিয়ত উৎসুক।
চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে,
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও
নয় খাঁচাটার থেকে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২২ নভেম্বর, ১৯২৪

চাবি

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে ।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে, "খুলে দাও" । উপায় জানি না খুলিবারে ।
বাহিরে আকাশ তাই ধুলায় আকুল করে হাওয়া ;
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসাযাওয়া ।

অন্তরের জনহীন পথে
হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালিকা লুটায় শরতে ।
আষাঢ়ের আর্দ্রবায়ুভরে
কদম্বকেশরে
চিহ্ন তার পড়ে ঢাকা ।
চৈত্র সে বিচিত্র বর্ণে কুসুমের আলিম্পনে আঁকা ।
সেথায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে ।
সন্ধ্যাতারা দিগন্তের কোণে
শিরীষ পাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে
যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণ-বাতাসে ।
ঝরাপাতা-বিছানো সে ঘাসে
বাঁশরি বাজাই আমি কুসুম-সুগন্ধি অবকাশে ।

দূরে চেয়ে থাকি একা
মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা

যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি; বক্ষে নিয়ে তুলে
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী;
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান;
খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান

বুয়েনোস এয়ারিস
২৬ নভেম্বর, ১৯২৪

বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,
তরল খড়্গের মতো ধারা তব, নাই তার ধ্বনি,
নাই তার তরঙ্গভঙ্গিমা;
নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা;
অমাবস্যা রজনীর
সুপ্তি সুগম্ভীর
মৌনী প্রহরের মতো
নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে ধায় অবিরত।
প্রাণের অরণ্যতট হতে
দণ্ড পল খসে খসে পড়ে তব অন্ধকার স্রোতে।
রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা,
বাণীর না থাকে এক কণা।

ওগো বৈতরণী,
কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে

কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি,
দিবসেরে রিক্ত করি', তিক্ত করি' আমার রাত্রিরে।
সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওগো বৈতরণী,
অদৃষ্টের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী
সেথায় নির্জনে
দেখি আমি আপনার মনে
তোমার অরূপ-তলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে,
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।
যে-সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
যে চিরমধুর।
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।
চোখের জলের মতো
একটি বর্ষণে যারা হয়ে গেছে গত,
চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা;
অনির্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৭ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু;
বলে, এস, এস, লও খুঁজে লও মোরে,
মধুসঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এস এ বক্ষ মাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবনবেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হেরো কী আশায় মাতি
আছে অঞ্জলি পাতি।

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণ-পক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি।

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি
এখনো তোমার সময় আসিল না কি ?
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ
পাও নি কি সংবাদ ?
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে-বারতা ?
শোন নি কী গাহে পাখি ?
হে কালো কাজল আঁখি।

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল,
বেণুশাখাগুলি খনে খনে টলমল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

বুয়েনোস এয়ারিস
১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
সে তো কভু পায় না সন্ধান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।
তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে,
হারায় সে নিখিলের গান।

জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন করুণ বিষাদ,
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবাদ।
চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শুধু শেখা।

পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই,
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রীষ,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে।
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন-হাওয়ার দান
তিন বসন্তে দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান।
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।

তবু ভাবি, যাই কেন হ'ক অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমায় মানিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নিচের তলায়,
হৃদয়টি ওর হ'ক না কঠোর, মিষ্টি তো ওর গলায়।

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আমলকীর ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন ফাগুনের দোল।
তবু ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি লুট
শেষ না হতেই নাচের পালা কোন্‌খানে দেয় ছুট।
আমি ভাবি এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হ'ক আমার তো মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলাম মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা তো আছে।

বন্দী হতে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে,
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছুঁয়ে
শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে
বুঝতে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
ক্ষয় নাহি যার সেই সুধা নয় দিত একটুখানি।
তবু ভাবি বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তারি কি কম দাম?
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে।

কবি ব'লে লোকসমাজে আছে তো মোর ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
জানে না যে ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ,
দোলার টানে বাঁধন মানে দূর আকাশের চাঁদ।

পলাতকার দল যত সব দখিন-হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোট্টো ওরি হৃদয়খানি দেয় না শুধু ধরা,
ঝগড়ু বোকার বরণমালা গাঁথে স্বয়ম্বরা।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি।

এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে-পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গ-ভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
খ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
সৃষ্টিছাড়া ব্যথা যত, নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের সুরে খুঁজবে আপন ভাষা।
দেখবে তখন ঝগড়ু বোকা কী করতে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির দ্বারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

অদেখা

আসিবে সে, আছি সেই আশাতে
শোন নি কি, দু-জনাকে
নাম ধরে ঐ ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে?
সুর বুকে আসে ভাসি,
পথ চেনাবার বাঁশি
বাজে কোন্ ওপারের বাসাতে।

ফুল ফোটে বনতলে
ইশারায় মোরে বলে
"আসিবে সে" ; আছি সেই আশাতে।

এল না তো এখনো সে এল না।
আলো-আঁধারের ঘোরে
যে-ডাক শুনিনু ভোরে,
সে শুধু স্বপন, সে কি ছলনা ?
হায় বেড়ে যায় বেলা,
কবে শুরু হবে খেলা,
সাজায়ে বসিয়া আছি খেলনা,
কিছু ভালো কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা,
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না।

আসে নি তো এখনো সে আসে নি।
ভেবেছিনু আসে যদি,
পাড়ি দেব ভরা নদী,
বসে আছি, আজো তরী ভাসে নি।
মিলায় সিঁদুর আলো,
গোধূলি সে হয় কালো,
কোথা সে স্বপন-বন-বাসিনী ?
মালতীর মালাগাছি,
কোলে নিয়ে বসে আছি,
যারে দেব, এখনো সে আসে নি।

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
সুবাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।

বুঝিয়াছি অনুভবে
বনমর্মর-রবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

চঞ্চল

হায় রে তোরে রাখব ধরে,
ভালোবাসা,
মনে ছিল এই দুরাশা।
পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে
বাসা যে তোর দিলেম বেঁধে
এল তুফান সর্বনাশা!
মনে আমার ছিল যে রে
ঘিরব তোরে হাসির ঘেরে;—
চোখের জলে হল ভাসা।
অনেক দুঃখে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,
সুখের ভিতে নহে তোমার
অচল বাসা।

এবার আমি সব-ফুরানো
পথের শেষে
বাঁধব বাসা মেঘের দেশে

ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনব
বদল ক'রো মূর্তি তব
রঙ-ফেরানো মায়ার বেশে।
কখনো বা জ্যোৎস্নাভরা
কখনো বা বাদলঝরা
খেয়াল তোমার কেঁদে হেসে।
যেই হাওয়াতে হেলাভরে
মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে
সেই হাওয়াতেই ফিরে ফিরে
আসবে ভেসে।

কঠিন মাটি বানের জলে
যায় যে বয়ে,
শৈলপাষাণ যায় তো ক্ষয়ে।
কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্বভরে
থাকতে যে চায় অচল হয়ে।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা,
হারায় যারা রয়ে রয়ে।
ভালোবাসা, তোমারে তাই
মরণ দিয়ে বরিতে চাই,
চঞ্চলতার লীলা তোমার
রইব সয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

প্রবাহিনী

দুর্গম দূর শৈলশিরের
স্তব্ধ তুষার নই তো আমি ;
আপনাহারা ঝরনা-ধারা
ধূলির ধরায় যাই যে নামি।
সরোবরের গম্ভীরতায়
ফেনিল নাচের মাতন ঢালি ;
অচল শিলার ভ্রূ-ভঙ্গিমায়
বাজাই চপল করতালি।
মন্দ্র-সুরের মন্ত্র শুনাই
গভীর গুহার আঁধার তলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
উচ্চহাসির কোলাহলে।
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই।
বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড়
আমার বেণী ধরিতে চায় ;
স্বর্ণকিরণ শিশুর মতন
অঙ্ক আমার ভরিতে চায়।
নাই কোনো মোর ভয়ভাবনা,
নাই কোনো মোর অচল রীতি।
গতি আমার সকল দিকেই,
শুভ আমার সকল তিথি।
বক্ষে আমার কালোর ধারা,
আলোর ধারা আমার চোখে,
স্বর্গে আমার সুর চলে যায়,
নৃত্য আমার মর্ত্যলোকে।

অশ্রুহাসির যুগল ধারা
ছোটে আমার ডাইনে বামে।
অচল গানের সাগরমাঝে
চপল গানের যাত্রা থামে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

আকন্দ

সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে
অকূল অন্ধকারে,
ছমছমিয়ে এল রাত্রি ভুবনডাঙার মাঠে
একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে।
নতুন-ফোঁটা গানের কুঁড়ি দেব বলে দিনুর হাতে আনি
মনে নিয়ে সুরের গুনগুনানি
চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পরীর কণ্ঠখানি
বাতাসেতে বাজিয়ে দিল বিনা ভাষার বাণী,
বললে আমায় "দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ওগো পথিক তোমার লাগি চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
আমায় নেবে চিনে
সেই সুলগন এল এতদিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছন্দে বাঁধব আমার বাসা।"
দেখা হল, চেনা হল সাঁঝের আঁধারেতে,
বলে এলেম, "তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।"

সেই কথা আজ পড়ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগরপারের দেশে,—
মন-কেমনের হাওয়ায় পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে'
তারি মধ্যে বাজল করুণ সুরে—

"ভুলো না গো ভুলো না এই পথবাসিনীর কথা,
আজো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা?"
শপথ আমার, তোমরা ব'লো তারে,
তার কথাটি দাঁড়িয়েছিল মনের পথের ধারে,—
ব'লো তারে চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে,—
লিখনখানি রাখিনু এইখানে।

আকন্দবল্লভ রবি

যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসবসভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী
সুরের বরণমাল্যে সবারে বরিয়া নিল কবি।
কী সংকোচে এলে না যে, সভার দুয়ার হল বন্ধ।
সব পিছে রহিলে আকন্দ।

মোরে তুমি লজ্জা কর নাই,
আমার সম্মান মানি তাই,
আমারে সহজে নিলে ডাকি।
আপনারে আপনি জানালে;
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিনু একা,
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কী জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ুভরে পাঠালে আকন্দ।

হিয়া মোর উঠিল চমকি
পথমাঝে দাঁড়ানু থমকি,
তোমারে খুঁজিনু চারিধারে।
পল্লবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের দুয়োরানী
পথপ্রান্তে গোপন আঁধারে।
সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে তারা সবে নামগোত্রহীন,
কাড়িতে জানে না তারা পথিকের আঁখি উদাসীন
ভরিল আমার চিত্ত বিস্ময়ের গভীর আনন্দ,
চিনিলাম তোমারে আকন্দ।

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুসুমকাননে,
জনতার প্রগল্‌ভ আদরে।
নিদ্রাহীন প্রদীপ-আলোকে
পড় নি অশান্ত মোর চোখে
প্রমোদের মুখর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি,
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশ্বাস মৃদু মন্দ,
নম্রহাসি উদাসী আকন্দ।

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরান ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালোবাসা।

দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার,
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ,
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ।

চাপাড মালাল
১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৪

কঙ্কাল

পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের একপাশে
পড়ে আছে ঘাসে,
যে-ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল,
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।

পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি,
কালের নীরস অট্টহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে।

আমি বলিলাম, মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব বিত্ত রিক্ত করি যার হয় যাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহারনিদ্রার শেষ ঋণ।

ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি, শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধরে নি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে ;
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্ত্যে তার কোথা পরিমাণ ?

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে ?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয় ;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

চাপাড মালাল
১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

চিঠি

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানি
প্রকাশ্যে তার থাক্ না যতই সাদা মুখের চঙ।
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম?
চারু কণ্ঠে ঠাঁই নাহি তার, ধুলায় পরিণাম।

যূথী বলে,"আতিথ্য লও, একটুখানি বসো।"
আমি বলি চমকে উঠে, আরে রসো, রসো;
জিতবে গন্ধ হারবে কি গান? নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম; জানিনে কার জিৎ।
তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান,
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি গেয়ো সেদিন, দিনু,
জুঁইবাগানের আরেক দিনের গান যা রচেছিনু।
ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিস বাজায় শিঙে।

জানি তুমি বলবে আমায়, থামো একটুখানি,
বেণুবীণার লগ্ন এ নয়, শিকল ঝমঝমানি।
শুনে আমি রাগব মনে, ক'রো না সেই ভয়,
সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তারা তো নয় ফাঁকি,
গিলটি-করা তকমা ঝোলা নয় তাহাদের খাকি।
কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা,
তাদের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন তবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনো তো সাজাবে জুঁই দেবার্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা,
লড়বে তারাই চিরটা কাল? গড়বে পাষাণ-কারা?
রাজপ্রতাপের দম্ভ সে তো এক দমকের বায়ু,
সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই বলে তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
তাই তো প্রেমের মাল্য গাথার নাইকো অবকাশ,
হাতকড়ারই কড়াকড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে,
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উলটো-দিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তবু,
ধমে রে যায় ঠেলা মেরে গায়ের-জোরের প্রভু।
রক্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।
বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।

কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্ত দেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।

টুটল কত বিজয় তোরণ, লুটল প্রাসাদ চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হ'লো গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব দুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন কুর্তি, সঙিন মূর্তি রইবে না কিচ্ছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর, প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হ'ক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে আমিই সত্য; দেবতা মিথ্যা মায়া;
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
মেশীন-গান-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান;

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই।
অজানা ভাষার দেশে
সহসা বলিলি এসে,
"আমারে চেন কি?"

তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সখী।
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি।"

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই।
আজ তাই পড়ে মনে
বাদল-সাঁঝের বনে
ঝর ঝর ধারা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া
যেন কী স্বপনে-পাওয়া,
ঘুরে ঘুরে সারা।
সজল তিমির-তলে তোর গন্ধ বলেছে নিঃশ্বাসি',
"আমি ভালোবাসি।"

মিলন-সুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।
মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল।
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কী বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
সে-রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি',
"আমি ভালোবাসি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।

বক্ষে এনেছিস কার
যুগযুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া ;
বারে বারে দ্বারে এসে
কোন্ নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া ?
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশি
"আমি ভালোবাসি।"

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে
কোন্ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন করে ?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদোষ-আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
তাই তোমার ঐ কাঁদন-হাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন্ সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্ সুদূর অশ্রু-ঢেউ।
সেখানে কোন্ রাজপুত্তুর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপকথারি ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তুমি জান না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়।

হয়তো সে কোন্ সকালবেলা শিশির-ঝলা পথে
জাগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার রথে,
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায় ;—
দুঃখ আমার, আর সে যে হ'ক, নয় সে দাদামশায়।

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা স্বপন টুটে'
তাই সে যে গেয়ে উঠে,
কিছু তার বুঝি নাহি বুঝি।
তাই সে যে পাখা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে,—
মলিন আকাশতলে
যেন কোন্ খেয়া চলে,
কে যে যায় সারি গান গেয়ে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্তনিশীথ-সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।
কে জানাল সে-কথা যে
গোপন হৃদয়মাঝে
আজো তাহা বুঝিতে পারি নি
মনে হয় পলে পলে
দূর পথে বেজে চলে
ঝিল্লি-রবে তাহার কিঙ্কিণী॥

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলিপরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ করে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি।
আমি বলি, বুঝাতে পারি নে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ববনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানি নে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
"কী কহ," সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে,
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

সৃষ্টিকর্তা

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমা রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি' শির নত,
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহরমাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি'
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বীণা-হারা

যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার
চমকি উঠিনু লাজে,
খুঁজে দেখি গৃহমাঝে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
সেদিন মেঘের ভারে
নদীর পশ্চিম পারে
ঘন হল দিগন্তের ভুরু,
বৃষ্টির নাচনে মাতা,
বনে মর্মরিল পাতা,
দেয়া গরজিল গুরু গুরু।
ভরা হল আয়োজন,
ভাবিনু ভরিবে মন
বক্ষে জেগে উঠিবে মল্লার,
হায়, লাগিল না সুর
কোথায় সে বহুদূর
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

কণ্ঠে নিয়ে এলে পুষ্পহার।
পুরস্কার পাব আশে
খুঁজে দেখি চারিপাশে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
প্রবাসে বনের ছায়ে
সহসা আমার গায়ে
ফাল্গুনের ছোঁয়া লাগে একী?

এপারের যত পাখি
সবাই কহিল ডাকি'
ওপারের গান গাও দেখি।
ভাবিলাম মোর ছন্দে
মিলাব ফুলের গন্ধে
আনন্দের বসন্তবাহার।
খুঁজিয়া দেখিনু বুকে,
কহিলাম নতমুখে,
"বীণা ফেলে এসেছি আমার।"

এল বুঝি মিলনের বার
আকাশ ভরিল ওই ;
শুধাইলে, "সুর কই ?"
বীণা ফেলে এসেছি আমার
ওগো বীনকার।
অস্তরবি গোধূলিতে
বলে গেল পূরবীতে
আর তো অধিক নাই দেরি।
রাঙা আলোকের জবা
সাজিয়ে তুলেছে সভা,
সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরি।
সুদূর আকাশতলে
ধ্রুবতারা ডেকে বলে,
"তারে তারে জাগাও ঝংকার।"
কানাড়াতে সাহানাতে
জাগিতে হবে যে রাতে,—
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

এলে নিয়ে শিখা বেদনার।
গানে যে বরিব তা'রে,—
চাহিলাম চারিধারে,—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
কাজ হয়ে গেছে সারা,
নিশীথে উঠেছে তারা,
মিলে গেছে বাটে আর মাঠে।
দীপহীন বাঁধা তরী
সারা দীর্ঘ রাত ধরি'
ভুলিয়া ভুলিয়া ওঠে ঘাটে।
যে-শিখা গিয়েছে নিবে
অগ্নি দিয়ে জ্বেলে দিবে
সে-আলোতে হতে হবে পার।
শুনেছি গানের তালে
সুবাতাস লাগে পালে ;
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

সান ইসিড্রো
২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে উর্ধ্বপানে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।
ধ্রুবত্বের মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার।

দয়া ক'রো, দয়া ক'রো, আরণ্যক এই তপস্বীরে,
ধৈর্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
এ কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ,—
দুরন্ত চুম্বন-বেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব॥

অকস্মাৎ দস্যুতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও
সর্বস্ব তাহার তব সাথে ?
ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
হবে তারে মুহূর্তে হারাতে।
যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
লুণ্ঠনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হাসি হেসে॥

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বরতলে,
শান্তিরূপে এস দিগঙ্গনা।
উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।
দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হ'ক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্বমাঝে
নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তার যে অনন্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তার খুলে।

তাহার গৌরবে নহ তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তারি ফলে তব সফলতা।

সান ইসিড্রো
২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪

পথ

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার-বাহিরে থামি এসে
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা,
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
সেথা হতে লেখে মোর ধূলিপটে দীপরশ্মিরেখা
অসম্পূর্ণ লেখা।

জীবনের সৌধমাঝে কত কক্ষ কত না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আজন্মবিধবা তারি এক প্রান্তে রয়েছি একাকী,
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম-দূরে থাকি,
লক্ষ্য নহি, উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ,
মোর নাহি শেষ।

উৎসবসভায় যেতে যে পায় আহ্বান-পত্রখানি
তাহারে বহন করে আনি।
সে-লিপির খণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
ধুলায় করিয়া লুপ্ত তাদের উড়ায়ে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
বহু বিস্মৃতির।

কেহ যারে নাহি শোনে, সবাই যাহারে বলে, "জানি",
আমি সেই পুরাতন বাণী।
বণিকের পণ্যযান, হে তুমি রাজার জয়রথ,
আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভুলিবার পথ,
তীব্র-দুঃখ মহা-দম্ভ, চিহ্ন মুছে গিয়েছে সবাই
কিছু নাই, নাই।

কভু সুখে, কভু দুঃখে নিয়ে চলি ; সুদিন দুর্দিন
নাহি বুঝি আমি উদাসীন।
বারবার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে,
চলে যায়,—সে-ও যায় যে যায় তাহারে দ'লে দ'লে,
বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শূন্যময়,
কিছু নাহি রয়।

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরি,
কারো নই, তাই সকলেরি।
বামে মোর শস্যক্ষেত্র দক্ষিণে আমার লোকালয়,
প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্তমান আঁকড়িয়া রয়।
আমি সর্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যখানে,
ভবিষ্যের পানে।

তাই আমি চির-রিক্ত কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি,
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি।
আমারে ভুলিবে ব'লে যাত্রীদল গান গাহে সুরে,
পারি নে রাখিতে তাহা, সে-গান চলিয়া যায় দূরে।
বসন্ত আমার বুকে আসে যবে ধুলায় আকুল,
নাহি দেয় ফুল।

পৌঁছিয়া ক্ষতির প্রান্তে বিত্তহীন একদিন শেষে
শয্যা পাতে মোর পাশে এসে।

পান্থের পাথেয় হতে খসে পড়ে যাহা ভাঙাচোরা,
ধূলিরে বঞ্চনা করি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা ;
আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর 'পরে নাই প্রীতিলেশ,
মোরে করে দ্বেষ।

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে
শিশু বোঝে মোরে।

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুশি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তারা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে,
মোরে ভালোবাসে।

সান ইসিড্রো
২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৪

মিলন

জীবন-মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি
সেখানে মিলেছিনু সময়হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজ একা ভেসে
কোথা যে কত দূর দেশে,

তরণী দুলিতেছে ঝড়ে ;—
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিনু আপন-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময় ;
প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্‌গামী,
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি।

বিজনে বসেছিনু আকাশ চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখিপাতে।
সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
বিশ্ব-হৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,

কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিনযামী,
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি।

বুঝিনু কী আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে ;—
কেন-যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে ;
অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি ;
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে ;
রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী,
বুঝিনু যবে দোঁহে পরান-পণে
খেলিনু তুমি আর আমি।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
৯ জানুয়ারি, ১৯২৫

অন্ধকার

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদি শঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি ;
সে তব সংকেত-মন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
কর্মের তরঙ্গে মোর ; স্বপ্ন-উৎস হতে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি।

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে, বাহিয়া জীবনযাত্রা মম,
—সিন্ধুগামী তরঙ্গিণীসম—
এতকাল চলেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে
বঙ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে
অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে।
কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা
অশেষের টানে।

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে "দ্বার খোলো"।

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আজ সে-সন্ধান হ'ক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হ'ক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে ভাবি তাই।
কত না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্তির পুরস্কার,
সযত্নে এসেছি বহে সেই সব রত্ন-অলংকার,

ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা,
দিনের আলোর সাথে ম্লান হয়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে।

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে,
সে-বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রাসহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবীমঞ্জরী,
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হতে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হতে জেগে দেখি, বসন্তে একদা রাত্রিশেষে
অরুণকিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধুলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে,
তুমি লও চিনে।

হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝি নি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান
আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১০ জানুয়ারি, ১৯২৫

প্রাণগঙ্গা

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্য দান
পূজারির পূজা অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবী-জলধারে,
পূজি আমি তারে।

বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে,
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটাজালে
ঘুরে ঘুরে কালে কালে
তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার।
কত না যুগের পাপভার
নিঃশেষে ভাসায়ে দিল অতলের মাঝে।
তরঙ্গে তরঙ্গে তার বাজে
ভবিষ্যের মঙ্গলসংগীত।
তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের চলেছে ইঙ্গিত।

দৈবস্পর্শে তার
আমারে সে ধূলি হতে করিল উদ্ধার;
অঙ্গে অঙ্গে দিল তার তরঙ্গের দোল;
কণ্ঠে দিল আপন কল্লোল।
আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষু দিল ভরি
বর্ণের লহরী।
খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরীয়,
কত রূপে দেখা দিল প্রিয়,
অনির্বচনীয়।

তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান
প্রাণজাহ্নবীরে।
তাহারি আবর্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল যাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
তবে তার লাগি, কহ,
কার সাথে আমার কলহ?
এই নীলাম্বরতলে তৃণরোমাঞ্চিত ধরণীতে,
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি' অবসান
ধন্য হয়ে ভেসে যাক গান।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৬ জানুয়ারি, ১৯২৫

বদল

হাসির কুসুম আনিল সে, ডালি ভরি
আমি আনিলাম দুখ-বাদলের ফল।
শুধালেম তারে "যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।"
হাসি' কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী
"এস না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অশ্রুর রসে ভরা।"
চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার
নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হল জয়" হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৭ জানুয়ারি, ১৯২৫

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রানী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"
শুনিয়া দাঁড়ালে তব বাতায়ন-'পরে
ঘোমটা আড়ালে কহিলে করুণ স্বরে,
"এখন শীতের দিন
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।"

কহিলাম, "ওগো রানী,
সাগরপারের নিকুঞ্জ হতে এনেছি বাঁশরিখানি।
উতারো ঘোমটা তব,
বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লব।"

কহিলে, "আমার হয় নি রঙিন সাজ,
হে অধীর কবি, ফিরে যাও তুমি আজ ;
মধুর ফাগুন মাসে
কুসুম-আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে।"

কহিলাম, "ওগো রানী,
সফল হয়েছে যাত্রা আমার শুনেছি আশার বাণী।
বসন্তসমীরণে
তব আহ্বানমন্ত্র ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।
মধুপমুখর গন্ধমাতাল দিনে
ওই জানালার পথখানি লব চিনে,
আসিবে সে সুসময়।
আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়।"

মিলান
২৪ জানুয়ারি, ১৯২৫

লেখক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুডাপেস্ট

২৬ কার্তিক

১৩৩৩

ভূমিকা

এই লেখাগুলি শুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্য লোকের অনুরোধেই এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে নয়, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্পর্শ নষ্ট হয়—সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা দীপশলাকার মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে। সেই [illegible] হাতের অক্ষর ছাপাবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখাগুলি ছাপিয়ে দেওয়া গেল। অস্বাস্থ্যবশতঃ কাটাকুটি ভুলচুক ঘটেছে। সে সব ত্রুটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়েরই আভাস রয়ে গেল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The lines in the following pages had their origin in China and Japan where the author was asked for his writings on fans or pieces of silk.

Rabindranath Tagore

Nov. 7. 1926
Balatonfüred. Hungary.

লেখন

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা॥

My fancies are fireflies
speaks of living light—
twinkling in the dark.

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে॥

The same voice murmurs
in these desultory lines
which is born in wayside pansies
letting hasty glances pass by.

প্রজাপতি সে তো বরষ না গণে,
নিমেষ গণিয়া বাঁচে,
সময় তাহার যথেষ্ট তাই আছে॥

The butterfly does not count years
but moments
and therefore has enough time.

ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাখির বাসা
কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসে-পড়া ভাঙা ভাষা।

ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে
পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে।
তার চেয়ে মোর এই ক-খানা হালকা কথার গান
হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান।

বসন্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল
হাওয়ায় কত ওড়ায় অবহেলায়।
নাহি ভাবে ভাবী কালের ফল,
ক্ষণকালের খামখেয়ালি খেলায়।

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ।

সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে,
সে তার আপন, তবু পায় না তাহাকে।

আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।

মাটির সুপ্তিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া,
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় ছুটে এসে দেয় নাড়া।

অতল আঁধার নিশা-পারাবার, তাহারি উপরিতলে।
দিন সে রঙিন বুদ্বুদ সম অসীমে ভাসিয়া চলে।

ভীরু মোর দান ভরসা না পায়
মনে সে যে রবে কারো,
হয়তো বা তাই তব করুণায়
মনে রাখিতেও পার।

ফাগুন, শিশুর মতো, ধূলিতে রঙিন ছবি আঁকে,
ক্ষণে ক্ষণে মুছে ফেলে, চলে যায়, মনেও না থাকে।

দেবমন্দির-আঙিনাতলে শিশুরা করেছে মেলা,
দেবতা ভোলেন পূজারি দলে, দেখেন শিশুর খেলা।

তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী,
আমার বনে রাঙা,
দোঁহার আঁখি চিনিল দোঁহে নীরবে
ফাগুনে ঘুম ভাঙা।

আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে,
তবুও আপনি অসীম সুদূরে থাকে।

দূর এসেছিল কাছে,
ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।

ওগো অনন্ত কালো,
ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোট ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো।

আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর
আয় গহ্বর ছেড়ে
গোধূলিতে এল শেষ যাত্রার অবসর,
হারিয়ে যা পাখা নেড়ে।

দাঁড়ায়ে গিরি, শির
মেঘে তুলে,
দেখে না সরসীর
বিনতি।
অচল উদাসীর
পদমূলে
ব্যাকুল রূপসীর
মিনতি।

ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা
খেলেন আলো-ছায়ার খেলা,
শিশুর মতো শিশুর সাথে
কাটান হেসে প্রভাত বেলা।

মেঘ সে বাষ্পগিরি,
গিরি সে বাষ্পমেঘ,
কালের স্বপ্নে যুগে যুগে ফিরি ফিরি
এ কিসের ভাবাবেগ।

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইঁট পাথরের জয়।

শিখারে কহিল
হাওয়া,
"তোমারে তো চাই
পাওয়া।"
যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে
নিবে গেল দাবি-দাওয়া।

দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে
সমুদ্র করে দান
অতল প্রেমের অশ্রু জলের গান।

তারার দীপ জ্বালেন যিনি
গগনতলে
থাকেন চেয়ে ধরার দীপ
কখন জ্বলে।

মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার,
নির্ঝরধারায় শৈল যেমন পরশে পারাবার।

নানা রঙের ফুলের মতো উষা মিলায় যবে
শুভ্র ফলের মতন সূর্য জাগেন সগৌরবে।

আঁধার সে যেন বিরহিণী বধূ
অঞ্চলে ঢাকা মুখ,
পথিক আলোর ফিরিবার আশে
বসে আছে উৎসুক।

হে আমার ফুল, ভোগী মূর্খের মালে
না হ'ক তোমার গতি,
এই জেনো তব নবীন প্রভাতকালে
আশিস তোমার প্রতি।

চলিতে চলিতে খেলার পুতুল খেলার বেগের সাথে
একে একে কত ভেঙে পড়ে যায়, পড়ে থাকে পশ্চাতে।

বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী,
রজনীগন্ধা যে তবু চেয়ে আছে বসি।

আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোঙর রহিল পাঁকে,
অধীর তরণী খুঁজিয়া না পায় কোথায় সে মুখ ঢাকে।

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায়।

কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল,
সে নহে মধুকর।
প্রেম যে তার বিষম ভুল
করিল জর্জর।

মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবহেলা লয় মেনে,
রাত্রে শিখায় চুম্বন পাবে জেনে।

দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা বচনহারা,
আঁধারে যে তাহা জ্বলে রজনীর দীপ্ত তারা।

গানের কাঙাল এ বীণার তার বেসুরে মরিছে কেঁদে।
দাও তার সুর বেঁধে।

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে।

আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে,
সৃষ্টি তারে বলে।

আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে করে রাখে,
ছবি বলি তাকে।

ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা
প্রেম যে তখন মোহন মদের ধারা।
কুসুম-ফোটার দিন হলে অবসান
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান।

দিন হয়ে গেল গত।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয় দুয়ারে
দূর-প্রভাতের ঘরে-ফিরে আসা
পথিক দুরাশা যত।

জীর্ণ জয়-তোরণ-ধূলি 'পর
ছেলেরা রচে ধূলির খেলাঘর।

রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে
হে মেঘ, করিলে খেলা।
চাঁদের আসরে যবে ডাকে তোরে
ফুরাল যে তোর বেলা।

খলিত পালক ধুলায় জীর্ণ
পড়িয়া থাকে।
আকাশে ওড়ার স্মরণচিহ্ন
কিছু না রাখে।

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরি
দিন বৃথা গেল, প্রিয়া।
তবুও তোমার ক্ষমা-হাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।

যখন পথিক এলেম কুসুমবনে
শুধু আছে কুঁড়ি ছুটি।
চলে যাব যবে, বসন্ত সমীরণে
কুসুম উঠিবে ফুটি।

হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া
ভুলায়ে বাহির করেছ মানবহিয়া।
নিত্য তোমার ভয়ের ভীষণ বাণী
দুঃসাহসের পথে তারে আনে টানি।

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি।

জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা,
জানে না আকাশে আছে তারা।

যবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি
ভালোবাসে ভগবান।

একটি পুষ্পকলি
এনেছিনু দিব বলি',
হায় তুমি চাও সমস্ত বনভূমি,
লও, তাই লও তুমি।

বসন্ত, তুমি এসেছ হেথায়
বুঝি হল পথ ভুল।
এলে যদি তবে জীর্ণ শাখায়
একটি ফুটাও ফুল।

চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
"রাখিব তোমায় চিরকাল মনে"
বলিয়া পড়িল টুটে।

আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর
উড়িবার ইতিহাস।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে।

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জ্বলে
ক্ষণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ ধরণীতলে।

কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি
তবু নিজ মহিমায় অবিচল গিরি।

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা।

একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়,
কাঁটা বিঁধে গেছে তার।
তবু, সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
করিনু নমস্কার।

হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা,
কোনো দায় নাহি তার।
আপনি সে পায় আপন পুরস্কার।

স্বল্প সেও স্বল্প নয় বড়োকে ফেলে ছেয়ে।
দু-চারিজন অনেক বেশি বহুজনের চেয়ে।

সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজ বাণী
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাসিখানি।

আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরষে
না-জানা সে কোন্ শুভ চুম্বন পরশে।

বুদ্বুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে,
শূন্যে মিলায়, জানে না সমুদ্রেরে।

বিরহপ্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি
মিলনস্মৃতির নির্বাণহীন বাতি।

মেঘের দল বিলাপ করে
আঁধার হল দেখে।
ভুলেছে বুঝি নিজেই তারা
সূর্য দিল ঢেকে।

ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার "দাও" বলি দাঁড়ালে দেবতা
মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্যবারতা।

গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে,
বাঁশির লাগিয়া গুণী ফিরিছে সন্ধানে।

অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে,
হোথায় পৃথিবী মনে মনে তার
অমরার ছবি আঁকে।

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা।

দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি ক্ষমা করে তবে
তাহে তার শান্তিলাভ হবে।

আকর্ষণগুণে প্রেম এক ক'রে তোলে।
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে।

মহাতরু বহে
বহু বরষের ভার।
যেন সে বিরাট
এক মুহূর্ত তার।

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল
কুসুমবন
সেদিন এসেছে আমার গানের
নিমন্ত্রণ।

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সব চেয়ে করেছে বিক্ষত।

স্তব্ধ অতল শব্দবিহীন মহাসমুদ্রতলে
বিশ্ব ফেনার পুঞ্জ সদাই ভাঙিয়া জুড়িয়া চলে।

নর-জনমের পুরা দাম দিব যেই
তখনি মুক্তি পাওয়া যাবে সহজেই।

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি,
শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি।

জন্ম মোদের রাতের আঁধার
রহস্য হতে
দিনের আলোর সুমহত্তর
রহস্যস্রোতে।

আমার প্রাণের গানের পাখির দল
তোমার কণ্ঠে বাসা খুঁজিবারে
হল আজি চঞ্চল।

নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে
অনাদরে যাহা দান কর অকাতরে
শরৎ-রাতের খসে-পড়া তারাসম
উজ্জ্বলি উঠে প্রাণের আঁধার মম।

মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা
বহিয়া আমার অকাজ দিনের অলসবেলার বোঝা।

অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা 'পরে
ফিরে যায় দ্বিধাভরে।
আমের মুকুল ছুটে বাহিরায়, কিছু না বিচার করে,
ফেরে না সে, শুধু মরে।

হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর তুমি সব অভিমান ত্যেজে,
কঠিন শাস্তি সে যে।
হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহ
সেই বড়ো দুঃসহ।

দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব মরণে নূতন হয়ে উঠে।
অসুরের অনাসৃষ্টি আপন অস্তিত্বভারে টুটে।

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন,
আদিম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন।

নূতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শূন্য আকাশমাঝে
পুরানো প্রেমের রিক্ত বাসায় বাসা তার মেলে না যে।

সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি
চির পুরাতন একটি চাঁপার বাণী।

দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে
বেদনার পরপার পানে।

ফেলে যবে যাও একা থুয়ে
আকাশের নীলিমায় কার ছোঁওয়া যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বনে বনে বাতাসে বাতাসে
চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি
যেমনি সূর্য বাহিরিয়া আসে মিলায় ঘোমটা টানি।

শিশির রবিরে শুধু জানে
বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে।

আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে
মরু চিরদিন বন্দী হইয়া থাকে।

ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি বৃক্ষরূপে শিখা তার তুলে;
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় ফুলে ফুলে।

ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্যেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা।

দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পায়।
প্রেম সে আমার চিরদিবসের চরম মূল্য চায়।

কর্ম আপন দিনের মজুরি রাখিতে চাহে না বাকি।
যে প্রেমে আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি।

আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা,
মেলে না কুয়াশা।

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কহে—
"যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নহে?"

পুঁথি-কাটা ওই পোকা
মানুষকে জানে বোকা।
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা।

আকাশে মন কেন তাকায় ফলের আশা পুষি?
কুসুম যদি ফোটে শাখায় তা নিয়ে থাক্‌ খুশি।

অনন্তকালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া,
মেঘান্ধ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী মায়া।

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পরিণত ফল,
আঁধার রজনী তারে ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল।

প্রজাপতি পায় অবকাশ
ভালোবাসিবারে কমলেরে।
মধুকর সদা বারোমাস
মধু খুঁজে খুঁজে শুধু ফেরে।
মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়
প্রভাতেরে চারিধারে,—
অন্ধ করিয়া বন্দী করে যে তারে।

শুকতারা মনে করে শুধু একা মোর তরে
অরুণের আলো।
উষা বলে, "ভালো, সেই ভালো"।

অজানা ফুলের গন্ধের মতো
তোমার হাসিটি, প্রিয়,
সরল মধুর, কি অনির্বচনীয়।

মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য,
মরণেরি শুধু ঘটে ততই বাহুল্য।

পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে
তীরের হৃদয় কান্না পাঠায় মিছে।

সত্য তার সীমা ভালোবাসে
সেথায় সে মেলে আসি সুন্দরের পাশে।

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গে শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে।

দিন দেয় তার সোনার বীণা
নীরব তারার করে—
চিরদিবসের সুর বাঁধিবার তরে।

ভক্তি ভোরের পাখি
রাতের আঁধার শেষ না হতেই "আলো" ব'লে ওঠে ডাকি।

সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে ফেলে দেয় তারে
নক্ষত্রের প্রাঙ্গণমাঝারে।
রাত্রি তারে অন্ধকারে ধৌত করে পুন ভরি দিতে
প্রভাতের নবীন অমৃতে।

দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন
শক্তি লভে,
রাতের মিলনে পরম শান্তি
মিলিবে তবে।

ভোরের ফুল গিয়েছে যারা
দিনের আলো ত্যেজে
আঁধারে তা'রা ফিরিয়া আসে
সাঁঝের তারা সেজে।

যাবার যা সে যাবেই, তারে
না দিলে খুলে দ্বার
ক্ষতির সাথে মিলায়ে বাধা
করিবে একাকার।

সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়
ধীরে কয় তটভূমি ;
"তরঙ্গ তব যা বলিতে চায়
তাই লিখে দাও তুমি।"
সাগর ব্যাকুল ফেন-অক্ষরে
যতবার লেখে লেখা
চির-চঞ্চল অতৃপ্তিভরে
ততবার মোছে রেখা।

পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল
চিরকালের ধন
নূতন, তুমি এনেছ তাই
করিয়া আহরণ।

মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে
চাঁদের কেমন ভাষা,
কোনো কথা নেই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা।

স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে না দেখা যায় তারে
চক্র যত নৃত্য করি ফিরিছে চারিধারে।

দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল
রাতে দীপ আলো দেয়।
দোঁহার তুলনা করা শুধু অন্যায়।

গিরি যে তুষার নিজে রাখে, তার
ভার তারে চেপে রহে।
গলায়ে যা দেয় ঝরনাধারায়
চরাচর তারে বহে।

কাছে থাকার আড়ালখানা
ভেদ ক'রে
তোমার প্রেম দেখিতে যেন
পায় মোরে।

ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি—
"খুলে দাও আঁখি"।

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে
কচিপাতা হয়ে এল দলে দলে অশথের গাছে।
বাতাসে মুক্তির দোলে ছুটি পেল ক্ষণিক বাঁচিতে
নিস্তব্ধ অন্ধের স্বপ্ন দেহ নিল আলোয় নাচিতে।

খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলেনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি ;
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায়।

দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে
হয়ে যায় হারা
আঁধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হয়ে জ্বলে
শত লক্ষ তারা।

আলোহীন বাহিরের আশাহীন দয়াহীন ক্ষতি
পূর্ণ করে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি।

অস্তরবির আলো-শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
ভ্রান্তিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

জীবন খাতার অনেক পাতাই
এমনিতরো শূন্য থাকে।
আপন মনের খেয়ান দিয়ে
পূর্ণ করে লও না তাকে।
সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন স্বর্গছবি,
পরশ করুক দৈববাণী
সেথায় তোমার কল্পনাকে।

দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা।

সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল
কখন ফুটিবে মোর অত বড়ো ফুল।

সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও
সন্ধ্যা মেঘের তরীতে।
যাও চলে রবি বেশভূষা খুলে
মরণ মহেশ্বরের দেউলে
নীরবে প্রণাম করিতে।

সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাত্রির তারারে
বন্দে নমস্কারে।

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাগ্র-সূচিতে
নিমেষে মিলায়,—তবু নিখিলের মাধুর্য-রুচিতে
স্থান তার চির স্থির; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে, নিত্য নষ্ট প্রতি পলে পলে।

দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা
সেই তো আমার প্রদীপ রাতের বেলা।

ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে—
বসন্ত আর নাই এ ধরণীতলে।

বসন্তবায়ু, কুসুম-কেশর
গেছ কি ভুলি?
নগরের পথে ঘুরিয়া বেড়াও
উড়ায়ে ধূলি।

হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কারে পায় খুঁজি।
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি।

দখিন হতে আনিলে, বায়ু,
ফুলের জাগরণ,
দখিন মুখে ফিরিবে যবে
উজাড় হবে বন।

ওগো হংসের পাঁতি,
শীত-পবনের সাথি,
ওড়ার মদিরা পাখায় করিছ পান।
দূরের স্বপনে মেশা
নভো-নীলিমার নেশা,
বলো, সেই রসে কেমনে ভরিব গান।

শিশির-সিক্ত বন-মর্মর
ব্যাকুল করিল কেন।
ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার
কানে কানে কথা যেন।

দিনান্তের ললাট লেপি'
রক্ত আলো চন্দনে
দিগ্বধূরা ঢাকিল আঁখি
শব্দহীন ক্রন্দনে।

নীরব যিনি তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে
তখন আমি তাঁরেও জানি মোরেও পাই জানিতে

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক্ মোর কাছে,
ফুল তুমি নিয়ো তুলে।

চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায়
স্তিমিত প্রদীপখানি
নিবিড় রাতের নিভৃত বীণায়
কী বাজায় কী বা জানি।

পৌরপথের বিরহী তরুর কানে
বাতাস কেন বা বনের বারতা আনে।

ও যে চেরিফুল তব বন-বিহারিণী,
আমার বকুল বলিছে "তোমারে চিনি"।

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু
বস্তুপিণ্ড-বোঝায় বদ্ধ বাহু।
মনে পড়ে সেই দীনের রিক্ত ঘরে
বাহুবিমুক্ত আলিঙ্গনের তরে।

গিরির দুরাশা উড়িবারে
ঘুরে মরে মেঘের আকারে

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে
কাছের চেয়ে সে কাছেতে আসে।

উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

চাঁদ কহে, "শোন্
শুকতারা,
রজনী যখন
হল সারা
যাবার বেলায়
কেন শেষে
দেখা দিতে হায়
এলি হেসে,
আলো আঁধারের
মাঝে এসে
করিলি আমায়
দিশে হারা।"

হতভাগ্য মেঘ পায় প্রভাতের সোনা,—
সন্ধ্যা না হতে ফুরায়ে ফেলিয়া
ভেসে যায় আনমনা।

ভেবেছিনু গনি গনি লব সব তারা
গনিতে গনিতে রাত হয়ে যায় সারা,
বাছিতে বাছিতে কিছু না পাইনু বেছে।
আজ বুঝিলাম, যদি না চাহিয়া চাই
তবেই তো একসাথে সব-কিছু পাই;
সিন্ধুরে তাকায়ে দেখো, মরিয়ো না সেঁচে

তোমারে, প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে
জানি তবুও জানি নি।
সকল কথা বল নি অভিমানিনী।

লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি,
তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী।

ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীতে
ফলের আশা ওরে!
ফুটিল ফুল ফাগুন-রজনীতে
বিফলে গেল ঝরে।

নিমেষকালের অতিথি যাহারা পথে আনাগোনা করে,
আমার গাছের ছায়া তাহাদেরি তরে।
যে জনার লাগি চিরদিন মোর আঁখি পথ চেয়ে থাকে
আমার গাছের ফল তারি তরে পাকে।

বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে।
যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীনা বন্ধন না মানে
মরে যায় ব্যর্থ ভস্মমাঝে।

কানন কুসুম-উপহার দেয় চাঁদে
সাগর আপন শূন্যতা নিয়ে কাঁদে।

লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে
লেখে যাহা তাও তার কাছে সবি মিছে।

মন্দ যাহা নিন্দা তার রাখ না বটে বাকি।
ভালো যেটুকু মূল্য তার কেন বা দাও ফাঁকি।

আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ
কাড়িয়ে নিতে চাঁদে,
বিনা বাঁধনে তাই তো চাঁদ
নিজেরে নিজে বাঁধে।

সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশিরমাঝে খোঁজে নিজ সীমা,

প্রভাত-আলোরে বিদ্রূপ করে ও কি
ক্ষুরের ফলার নিষ্ঠুর ঝকমকি?

একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব,
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ।

প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা,
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা।

আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে,
আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে।

ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে
সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্তে নহে নহে।

ধুলায় মারিলে লাথি ঢোকে চোখে মুখে।
জল ঢালো, বালাই নিমেষে যাবে চুকে।

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।

ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে,
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।

আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে
তারে যদি দয়া বল, শোনায় না মিঠে।

হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই
কিন্তু "কাজ করা যাক" বলিয়ো না ভাই।

কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক।
কাজের মানুষ কিন্তু ধিক তারে ধিক।

একাকার কর্ম্মে খেলে আপনারি সঙ্গে,
সিন্ধুর স্তব্ধতা দোলে সিন্ধুর তরঙ্গে ॥

প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান,
প্রাণ দিয়া লভি তাই যাহা মূল্যবান ॥

রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা,
মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটাগাছ বোঁচা ॥

দর্পণে যাহারে দেখি সেই আমি ছায়া,
তারে লয়ে গর্ব্ব করি অপূর্ব্ব এ মায়া ॥

আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যদি হবে
নিজেকে নিজের কাছে নত করো তবে ॥

প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ
প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ ॥

দুঃখেরে যখন প্রেম করে শিরোমণি
তাহারে আনন্দ বলে চিনি যে তখনি ॥

অমৃত যে সত্য, তার নাহি পরিমাণ,
[illegible] নিত্য নিত্য করিছে প্রমাণ ॥

নাটক ও প্রহসন

মুক্তধারা

মুক্তধারা

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আম্রবাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝরনাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে। ভৈরব-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিদল সমস্তদিন স্তবগান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কাহারও হাতে শঙ্খ, কাহারও ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে।

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর,
শংকর শংকর।
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শংকর শংকর।

[সন্ন্যাসিদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল

পূজার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ

উত্তরকূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল

পথিক। আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে।

নাগরিক। জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

পথিক। কিসের যন্ত্র?

নাগরিক। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল, সেটা ওই তো শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক। যন্ত্রের কাজটা কী?

নাগরিক। মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধেছে।

পথিক। বাবা রে। ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবনা ক'রো না।

পথিক। তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

নাগরিক। আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না?

পথিক। দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই তো এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ওইটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাচ্ছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না। [প্রস্থান

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে

স্ত্রীলোক। সুমন। আমার সুমন। (নাগরিকের প্রতি) বাবা আমার সুমন এখনও ফিরল না। তোমরা তো সবাই ফিরেছ।

নাগরিক। কে তুমি?

স্ত্রীলোক। আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার সুমন।

নাগরিক। তার কী হয়েছে বাছা?

অম্বা। তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পথিক। তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা। আমি শুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ওই গৌরীশিখরের পশ্চিমে—সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

পথিক। কেঁদে কী হবে? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আমাদের বড়ো দিন, তুমিও চলো।

অম্বা। না বাবা, সেদিনও তো ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পুজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখো আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো বাবার কাছে পৌঁছচ্ছে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক। কে নিচ্ছে ?

অম্বা। যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনও তো বুঝলুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।

দূত। যন্ত্ররাজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি। কী তাঁর আদেশ ?

দূত। এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি। দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত—

বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না ?

বিভূতি। বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে-কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনও কি ভাববার সময় হয় নি ?

বিভূতি। না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত। ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না ?

বিভূতি। না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত। অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি। অভিশাপ! দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দূত। যুবরাজ বলছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

বিভূতি। কীর্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত। যুবরাজ বলছেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি। স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দূত। তিনি বলেন—উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে ব'লো আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দূত। ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

বিভূতি। (চমকিয়া) ছিদ্র? সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান?

দূত। আমি কি জানি? যাঁর জানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন।

[দূতের প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া

১। বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি তো বেশ লোক। কখন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে এসেছ টেরও পাই নি।

২। সে তো ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন ভিতরে ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো আমাদের চবুয়াগাঁয়ের নেড়া বিভূতি, আমাদের একসঙ্গেই কৈলেস-গুরুর কানমলা খেলে, আর কখন সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে এতবড়ো কাণ্ডটা করে বসল।

৩। ওরে গবরু, ঝুড়িটা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি? মালাগুলো বের কর্, পরিয়ে দিই।

বিভূতি। থাক্ থাক্ আর নয়।

৩। আর নয় তো কী? যেমন তুমি হঠাৎ মস্ত হয়ে উঠেছ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মতো হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠত আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক মানাত।

২। ভাই, হরিশ ঢাকি তো এখনও এসে পৌছোল না।

১। বেটা কুঁড়ের সর্দার, ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—

৩। সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজবুত।

৪। মনে করেছিলুম বিশাই সামন্তের রথটা চেয়ে এনে আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন।

৫। ভালোই হয়েছে। সামন্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ। পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।

৩। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ। আমাদের লম্বু এক-একটা কথা বলে ভালো। দশরথ।

৫। সাধে বলি। ছেলের বিয়েতে ওই রথটা চেয়ে নিয়েছিলুম। যত চড়েছি তার চেয়ে টেনেছি অনেক বেশি।

৪। এক কাজ কর। বিভূতিকে কাঁধে করে নিয়ে যাই।

বিভূতি। আরে কর কী। কর কী।

৫। না, না, এই তো চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

[কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল।

সকলে। জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

গান

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংস-বিকট দন্ত।

তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল-চলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টকদৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।

[বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রণজিৎ। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে। কিন্তু মন্ত্রী তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ঈর্ষা?

মন্ত্রী। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খন্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিৎ। তাতে ফল হল কী? দুবছর খাজনা বাকি। এমনতরো দুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী। খাজনার চেয়ে দুর্মূল্য জিনিস আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।

রণজিৎ। তোমার মন্ত্রণার সুর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নিচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।— এ-কথা বল নি?

মন্ত্রী। বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সময়োচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

রণজিৎ। যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ?

রণজিৎ। যে প্রজারা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভুলছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে, তিনি হয়তো কোনো সূত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে—

রণজিৎ। তা তো জানি—ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরনাতলায় গিয়ে শুয়ে থাকত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী হয়েছে অভিজিৎ, এখানে কেন?" ও বললে, "এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই।"

মন্ত্রী। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "তোমার কী হয়েছে যুবরাজ? রাজবাড়িতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন?" তিনি বললেন, "আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।"

রণজিৎ। ওই ছেলের যে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্ছে।

মন্ত্রী। যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী।

রণজিৎ। ভুল করেছেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী। অল্প বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিৎ। কিন্তু এ যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ওই যে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের খেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কণ্ঠিসুদ্ধ তার কণ্ঠটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছার প্রতিবাদ করতে সাহস করি নে। কিন্তু জানেন তো এমন সব দুর্যোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিৎ। আচ্ছা সেজন্যে চিন্তা ক'রো না।

মন্ত্রী। আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে। [প্রস্থান

রণজিৎ। ওই আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মানুষের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ।—ও কিসের শব্দ?

মন্ত্রী। ভৈরবপন্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান

তিমির-হৃদবিদারণ
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর শংকর। [প্রস্থান

রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন

তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ

রণজিৎ। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।

বিশ্বজিৎ। উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেছি।

রণজিৎ। তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ। কী নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ। শত্রু দমনের জন্যে।

বিশ্বজিৎ। মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ। যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ। তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিৎ। খুড়া মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজের রাজ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

বিশ্বজিৎ। আমার শিক্ষায়? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করি নি? শেষে কখন ওই বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল— আলোর মতো এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ওই উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও?

রণজিৎ। মুক্তধারার ঝরনাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এ-কথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বুঝি?

বিশ্বজিৎ। হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কী দেখছ, ভাই?" সে বললে, "যে-সব পথ এখনও কাটা হয় নি ওই দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।" শুনে তখনই মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বললুম, "ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরের শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।"

রণজিৎ। এতক্ষণে বুঝলুম।

বিশ্বজিৎ। কী বুঝলে?

রণজিৎ। এই কথা শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্যে নন্দিসংকটের পথ সে খুলে দিয়েছে।

বিশ্বজিৎ। ক্ষতি কী হয়েছে? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই—যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিৎ। খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্য রেখেছি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও।

বিশ্বজিৎ। আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব। [প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। (রাজার প্রতি) ওগো তোমরা কে? সূর্য তো অস্ত যায়—আমার সুমন তো এখনও ফিরল না।

রণজিৎ। তুমি কে?

অম্বা। আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? সুমন কি তবে এখনও চলেছে, কেবলই চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?

রণজিৎ। মন্ত্রী, এ বুঝি—

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিৎ। (অম্বাকে) তুমি খেদ ক'রো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে।

অম্বা। তাই যদি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধ্যেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ। দেবে এনে। সেই সন্ধ্যে এখনও আসে নি।

অম্বা। তোমার কথা সত্যি হ'ক, বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। সুমন। [প্রস্থান

একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল

গুরু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। (হাতের কাছে দুই একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া)—জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর।

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গুরু। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ। উত্তরকূটা—

গুরু। —ধিপতির

ছাত্রগণ। ধিপতির

গুরু। জয়।

ছাত্রগণ। জয়।

রণজিৎ। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিৎ। বিভূতি কি করেছে এরা সবাই জানে তো?

ছেলেরা। (লাফাইয়া হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ। কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা?

ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিৎ। কেন খারাপ?

ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না?

গুরু। জানে বই কি, মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি—ওদের ধর্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু। আর ওরা আমাদের মতো—কী বল্ না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।

গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচু থাকলে কী হয়?

ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।

গুরু। তারা কী করে? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?

ছেলেরা। হাঁ, জয়ী হয়।

গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?

ছেলেরা। কোনোদিনই না।

গুরু। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্‌জিৎ দু-শ তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা। হাঁ দিয়েছিলেন।

গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন, মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতবড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু ওই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান করিল।

রণজিৎ। তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।

মন্ত্রী। পঞ্চগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এইসব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনিটি করে চলেছে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না।

রণজিৎ। মন্ত্রী, ওটা কী, আকাশে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ। এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী। আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ। দেখেছ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয় নি।

মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

রণজিৎ। এখন মন্দিরে যাবার সময় হল। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ

১। দেখলি তো, আজকাল বিভূতি আমাদের কী রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘষে ফেলতে চায়। একদিন বুঝতে পারবেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না।

২। তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেছে বটে।

১। আরে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস। ওই যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে ওটা কিছু না হবে তো দশবার ভেঙেছে।

৩। আবার যে ভাঙবে না তাই বা কে জানে?

১। দেখেছিস তো বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা?

২। কেন, কেন, কী হয়েছে?

১। কী হয়েছে? এটা জানিস নে? যে দেখছে সেই তো বলছে—

২। কী বলছে ভাই?

১। কী বলছে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্‌গেস করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই—সে আর কী বলব।

২। তবু ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বল্ না—

১। রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটু সবুর কর্ না, পষ্ট বুঝবি হঠাৎ যখন একেবারে—

২। সর্বনাশ। বলিস কী দাদা? হঠাৎ একেবারে?

১। হাঁ ভাই, ঝগড়ুর কাছে শুনে নিস। সে নিজে মেপে জুখে দেখে এসেছে।

২। ঝগড়ুর ওই গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে বসে।

৩। আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা কিছু বিদ্যে সব—

১। আমি নিজে জানি বেঙ্কটবর্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গুণীর মতো গুণী—কত বড়ো মাথা—ওরে বাস রে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আর সে গরিব না খেতে পেয়েই মারা গেল।

৩। শুধুই কি না খেতে পেয়ে ?

১। আরে না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কী খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কী? আবার কে কোন্ দিক থেকে—নিন্দুকের তো অভাব নেই। এ দেশের মানুষ যে কেউ কারও ভালো সইতে পারে না।

২। তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিন্তু—

১। আহা, তা হবে না কেন ? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, বুঝে দেখ্ ওই চবুয়া গাঁয়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার নাম শুনেছিস তো ?

২। আরে বাস রে! তাঁর নাম উত্তরকূটের কে না জানে ? তিনি তো সেই—ওই যে কী বলে—

১। হাঁ, হাঁ, ভাস্কর। নস্যি তৈরি করার এত বড়ো ওস্তাদ এ মুল্লুকে হয় নি। তাঁর হাতের নস্যি না হলে রাজা শক্রজিতের একদিনও চলত না।

৩। সে সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্। আমরা হলুম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক—আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আমরাই তো বসব তার ডাইনে।

নেপথ্যে। যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

২। ওই শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েছে।

বটুকের প্রবেশ

গায়ে ছেঁড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উস্কোখুস্কো

১। কী বটু, যাচ্ছ কোথায় ?

বটু। সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।

২। কেন বলো তো ?

বটু। বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না।

৩। বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো ?

বটু। তৃষ্ণা, তৃষ্ণা দানবীর কাছে।

২। সে আবার কে ?

বটু। সে যত খায় তত চায়—তার শুষ্ক রসনা ঘি-খাওয়া আগুনের শিখার মতো কেবলই বেড়ে চলে।

১। পাগলা! আমরা তো যাচ্ছি উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণা দানবী কোথায়?

বটু। খবর পাও নি? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে।

২। চুপ চুপ পাগলা। এসব কথা শুনলে উত্তরকূটের মানুষ তোকে কুটে ফেলবে।

বটু। তারা তো আমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতি দুটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সৌভাগ্য।

১। তারা তো মিথ্যে বলে না।

বটু। বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ো না ও পথে। [প্রস্থান

২। দেখো, দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠছে।

১। রঞ্জু, তুই বেজায় ভীতু। চল্ চল্। [সকলের প্রস্থান

যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। বুঝতে পারছি নে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?

অভিজিৎ। সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়। কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল।

অভিজিৎ। ওই দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিলে।

সঞ্জয়। দেখছ না, যুবরাজ, ওই যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্ত-মেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চলো, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ। যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়। রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কি করে বুঝলে?

অভিজিৎ। বুঝলুম, যখন শোনা গেল মুক্তধারায় ওরা বাঁধ বেঁধেছে।

সঞ্জয়। তোমার এ কথার অর্থ আমি পাই নে।

অভিজিৎ। মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ওই মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।

সঞ্জয়। যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও।

অভিজিৎ। না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়। তুমি অত কঠোর হ'য়ো না, আমাকে বাজছে।

অভিজিৎ। তুমি আমার হৃদয় জান, সেইজন্যে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুঝবে।

সঞ্জয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ওই যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে—কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ। পড়ছে বই কি। সেইজন্যেই সইতে পারছি নে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়। গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁছচ্ছে না?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌঁছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখি নে।—চেয়ে দেখো ওই পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে

যাত্রা করবে জানি নে; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

বটুর প্রবেশ

বটু। যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিৎ। কি হয়েছে, বটু, তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে।

বটু। আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম, বলছিলুম, "যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।"

অভিজিৎ। কেন, কী হয়েছে?

বটু। জান না, যুবরাজ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ-বলি চায়।

সঞ্জয়। সে কী কথা?

বটু। সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার দুই নাতির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনও তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না।

অভিজিৎ। ভাঙবে। সময় এসেছে।

বটু। (কাছে আসিয়া চুপে চুপে) তবে শুনেছ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ?

অভিজিৎ। শুনেছি।

বটু। সর্বনাশ। তবে তো তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অভিজিৎ। না, নেই।

বটু। এই দেখছ না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধুলো। সইতে পারবে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে!

অভিজিৎ। ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু। চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোক যখন ধিক্কার দেবে?

অভিজিৎ। সইতেই হবে।

বটু। তাহলে ভয় নেই?

অভিজিৎ। না ভয় নেই।

বটু। বেশ বেশ। তাহলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ওই পথে। ভৈরব আমার কপালে এই যে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে। [বটুর প্রস্থান

রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবরাজ ?

অভিজিৎ। শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উদ্ধব। মহারাজ তো তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, তাঁর তো দয়ামায়া আছে।

অভিজিৎ। ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।

উদ্ধব। মহারাজ বলেন, নন্দিসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকূটের ভোজন-পাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিৎ। চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে উত্তর-কূটকে মুক্তি দিয়েছি।

উদ্ধব। দুঃসাহসের কাজ করেছ। মহারাজ খবর পেয়েছেন এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়। [উদ্ধবের প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। সুমন। বাবা সুমন। যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি ?

অভিজিৎ। তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে ?

অম্বা। হাঁ, ওই পশ্চিমে, যেখানে সূর্যি ডোবে, যেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিৎ। ওই পথেই আমি যাব।

অম্বা। তাহলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা পাবে, ব'লো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ। বলব।

অম্বা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন। [প্রস্থান

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়-ভেদন জয় বন্ধন-ছেদন
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ

বিজয়পাল। যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহারাজের কাছ থেকে আসছি।

অভিজিৎ। কী তাঁর আদেশ?

বিজয়পাল। গোপনে বলব।

সঞ্জয়। (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) গোপন কেন? আমার কাছেও গোপন?

বিজয়পাল। সেই তো আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়। আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয়পাল। মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়। আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল

বাউলের প্রবেশ

গান

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী
কূলে আর ভিড়বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে। [প্রস্থান

ফুলওয়ালীর প্রবেশ

ফুলওয়ালী। বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?

সঞ্জয়। কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন?

ফুলওয়ালী। আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আসছি। শুনেছি উত্তরকূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি করছে। সাধুপুরুষ বুঝি? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালঞ্চের ফুল এনেছি।

সঞ্জয়। সাধুপুরুষ না হ'ক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী। কী কাজ করেছেন তিনি?

সঞ্জয়। আমাদের ঝরনাটাকে বেঁধেছেন।

ফুলওয়ালী। তাই পুজো? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে?

সঞ্জয়। না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।

ফুলওয়ালী। তাই পুষ্পবৃষ্টি? বুঝলুম না।

সঞ্জয়। না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট ক'রো না, ফিরে যাও।— শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ওই শ্বেতপদ্মটি বেচবে?

ফুলওয়ালী। সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিলুম সে তো বেচতে পারব না।

সঞ্জয়। আমি যে-সাধুকে সব চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।

ফুলওয়ালী। তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। ব'লো আমি দেওতলির দুখনী ফুলওয়ালী। [প্রস্থান

বিজয়পালের প্রবেশ

সঞ্জয়। দাদা কোথায়?

বিজয়পাল। শিবিরে তিনি বন্দী।

সঞ্জয়। যুবরাজ বন্দী! এ কী স্পর্ধা।

বিজয়পাল। এই দেখো মহারাজের আদেশপত্র।

সঞ্জয়। এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে দাও।

বিজয়পাল। ক্ষমা করবেন।

সঞ্জয়। আমাকেও বন্দী করো, আমি বিদ্রোহী।

বিজয়পাল। আদেশ নেই।

সঞ্জয়। আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চল্লুম। (কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে দাদাকে দিয়ো। [উভয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ[১]

গান

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে

১ এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রায়শ্চিত্ত" নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।

তোমার ওই পায়েতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে।

শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ

ধনঞ্জয়। একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কী হয়েছে?

১। প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরও অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়। ওরে আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে?

২। রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার। বড়ো অপমান।

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছোবে না।

গণেশ সর্দারের প্রবেশ

গণেশ। আর সহ্য হয় না, হাত দুটো নিশপিশ করছে।

ধনঞ্জয়। তাহলে হাত দুটো বেহাত হয়েছে বল্।

গণেশ। ঠাকুর, একবার হুকুম করো ওই ষণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

৪। তাহলে কী করতে বল?

ধনঞ্জয়। মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।

৩। সেটা কী করে হবে প্রভু?

ধনঞ্জয়। মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২। লাগছে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়। আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে। হাঁ করে রইলি যে? কথাটা বুঝলি নে?

২। তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়। তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ। কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।

ধনঞ্জয়। তার পরে বিকেল যখন হবে। তখন দেখবি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস তো মজবি।

গণেশ। ও কথা ব'লো না, ঠাকুর। তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি তখন যে করে হ'ক বুঝেছি।

ধনঞ্জয়। বুঝিস নি যে তা আর বুঝতে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। একটু স্বর ধরিয়ে দেব?

গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো।

এমনি করেই মারো, মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মরতে নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,

ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই;

যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, "মার আমায় বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।" যে ভরে কিম্বা ভয় দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো, সারো,

আমিই হারি, কিম্বা তুমিই হারো।

হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

সকলে। শাবাশ, ঠাকুর, তাই সই।—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

২। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ, বলো তো?

ধনঞ্জয়। রাজার উৎসবে।

৩। ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কী দাঁড়ায় বলা যায় কি? সেখানে কী করতে যাবে?

ধনঞ্জয়। রাজসভায় নাম রেখে আসব।

৪। রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। হবে না কী রে? খুব হবে, পেট ভরে হবে।

১। রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।

২। আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩। রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

৩। চাইবার তো আছে ঢের, দেয় তবে তো?

ধনঞ্জয়। রাজত্ব চাইবি নে?

৩। ঠাট্টা করছ, ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব? এক পায়ে চলার মতো কি দুঃখ আছে? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২। যখন তাড়া লাগাবে?

ধনঞ্জয়। রাজদরবারের উপরতলার মানুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে।

গান

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন 'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বলব, বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো বুক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে বসা চাই।

দ্বারী মোদের চেনে না যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধুলোয় ধুলোয় কপালের রাজটিকা যে মিলিয়ে এসেছে। ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুটবি? রাজা হলেই রাজাসনে বসে; রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে
মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে।

১। যাই বল, রাজদুয়োরে কেন যে চলেছ বুঝতে পারলুম না।

ধনঞ্জয়। কেন, বলব? মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছে।

১। সে কী কথা?

ধনঞ্জয়। তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেছি সেইখানে, যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১। কিন্তু রাজা তোমাকে তো সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বে কেন রে। যদি আমাকে বাঁধতে পারে তাহলে আর ভাবনা রইল কী?

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে ?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অমনি হবে ?
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে ?
সে কি অমনি হবে ?
আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক প্রেমের রসে,
সে কি অমনি হবে ?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অমনি হবে ?

২। কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা বিকিয়েছি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও সইবে।

১। আচ্ছা, চলো ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়ে আসি, তার পরে কপালে যা থাকে।

ধনঞ্জয়। তবে তোরা এইখানে ব'স, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি। [প্রস্থান

১। দেখছিস, ভাই, কী চেহারা ওই উত্তরকূটের মানুষগুলোর ? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন শেষ করে উঠতে ফুরসৎ পান নি।

২। আর দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবার ধরনটা ?

৩। যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হয়।

১। ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

২। ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শাস্তর তার মধ্যে আছে কী ?

১। কিছু না, কিছু না, দেখিস নি তার অক্ষরগুলো উইপোকার মতো।

২। উইপোকাই তো বটে। ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে কেটে টুকরো টুকরো করে।

৩। আর গড়ে তোলে মাটির ঢিবি।

২। ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

২। পাপ, পাপ। আমাদের গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস ?

৩। কেন বল তো ?

২। তা জানিস নে ? সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ—অপবিত্র।

৩। এ তুই কোথায় পেলি ?

২। স্বয়ং গুরু বলে দিয়েছেন।

৩। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) গুরু, তুমিই সত্য।

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

উ ১। আর সব হল ভালো, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে রাজা একেবারে ক্ষত্রিয় করে নিলে সেটা তো—

উ ২। ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে নেব। এখন বল্, জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ৩। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে যে মিলিয়েছে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১। ও ভাই, ওই যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২। কী করে বুঝলি ?

উ ১। কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে ? কীরকম অদ্ভুত দেখতে ? যেন উপর থেকে থাবড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।

উ ২। আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন ? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম ?

উ ১। কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়। (সকলের হাস্য)

উ ৩। তাই ? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে। (হাস্য)

উ ১। পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হয়েছে কী রে ?

উ ৩। জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন। বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১। চুপ করে রইলি যে ? গলা বুজে গেছে ? টুঁটি চেপে না ধরলে আওয়াজ বেরোবে না বুঝি ? বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

গণেশ। কেন বিভূতির জয় ? কী করেছে সে ?

উ ১। বলে কী ? কী করেছে ? এত বড়ো খবরটা এখনও পৌঁছয় নি ? কান-ঢাকা টুপির গুণ দেখলি তো ?

উ ৩। তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে ; সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙ-গুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাবি।

শি ২। পিপাসার জল বিভূতির হাতে ? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি ?

উ ২। দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।

শি ১। দেবতার কাজ! তার একটা নমুনা দেখি তো ?

উ ১। ওই যে মুক্তধারার বাঁধ। [শিবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্য

উ ১। এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেছিস ?

গণেশ। ঠাট্টা নয় ? মুক্তধারা বাঁধবে ? ভৈরব স্বহস্তে যা দিয়েছেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে ?

উ ১। স্বচক্ষে দেখ্ না, ওই আকাশে।

শি ১। বাপ রে। ওটা কী রে ?

শি ২। যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।

উ ১। ওই ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে।

গণেশ। রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্ দিন বলবে ওই ফড়িঙের ডানায় বসে তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধরতে বেরিয়েছে।

উ ১। ওই দেখো কান ঢাকার গুণ! ওরা শুনেও শুনবে না তাই তো মরে।

শি ১। আমরা মরেও মরব না পণ করেছি।

উ ৩। বেশ করেছ, বাঁচাবে কে ?

গণেশ। আমাদের দেবতাকে দেখ নি ? প্রত্যক্ষ দেবতা ? আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর ? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ ৩। কানঢাকারা বলে কী ? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[উত্তরকূটের দলের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। কী বলছিলি রে বোকা ? আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার ? তাহলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।

গণেশ। উত্তরকূটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বেঁধেছে।

ধনঞ্জয়। বাঁধ বেঁধেছে, বললে ?

গণেশ। হাঁ, ঠাকুর।

ধনঞ্জয়। সব কথাটা শুনলি নে বুঝি ?

গণেশ। ও কি শোনবার কথা ? হেসে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়। তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেছিস ? তোদের সবার শোনা আমাকেই শুনতে হবে ?

শি ৩। ওর মধ্যে শোনবার আছে কী, ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। বলিস কী রে ? যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা ? তা সে অন্তরেই হ'ক আর বাইরেই হ'ক।

গণেশ। ঠাকুর, তাই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে ?

ধনঞ্জয়। সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা ব'স, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে। [ধনঞ্জয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ

শি ৩। এ কী বিষণ যে। খবর কী ?

বিষণ। যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে। সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ। কী করবি ?

সকলে। ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ। কী করে ?

সকলে। জোর করে।

বিষণ। রাজার সঙ্গে পারবি ?

সকলে। রাজাকে মানি নে।

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রণজিৎ। কাকে মানিস নে ?

সকলে। প্রণাম।

গণেশ। তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রণজিৎ। কিসের দরবার ?

সকলে। আমরা যুবরাজকে চাই!

রণজিৎ। বলিস কী?

১। হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ। আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি?

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে।

রণজিৎ। তোদের সর্দার কোথায়?

২। (গণেশকে দেখাইয়া) এই যে আমাদের গণেশ সর্দার।

রণজিৎ। ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ। ওই আসছেন।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ। তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খ্যাপাই বই কি, নিজেও খেপি।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে?
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজায় কোন্ বাতাসে?
গেল রে গেল বেলা,
পাগলের কেমন খেলা?
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা,
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি হোন্ হতাশে।

রণজিৎ। পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা দেবে কি না, বলো।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ। দেবে না? এত বড়ো আস্পর্ধা?

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ। আমার নয়?

ধনঞ্জয়। আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ। তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ যিনি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিৎ। তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বই তো নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। তখন ওরা মরবে যে। দেখো, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি। দুঃখের উপরওআলা সেইখানে বাস করেন।

রণজিৎ। (প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে। আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না।

ধনঞ্জয়। গান

রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
টানাটানি টিকবে না, ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।

রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

রণজিৎ। মানে কী হল?

ধনঞ্জয়। যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিঁকবে না।

গান

যা-খুশি তাই করতে পার,
গায়ের জোরে রাখ মার,
যাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে
তিনিই যা সন সেটাই সবে।

রাজা, ভুল করছ এই, যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।

গান

ভাবছ, হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,

দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

রণজিৎ। মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ—

রণজিৎ। আদেশটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না?

মন্ত্রী। শাসনের ভীষণ যন্ত্র তো তৈরি হয়েছে, তার উপরে ভয় আরও চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা। এ আমাদের সহ্য হবে না।

ধনঞ্জয়। যা বলছি, ফিরে যা।

১। ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েছি, শোন নি বুঝি?

২। তাহলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব?

ধনঞ্জয়। আমার জোরেই কি তোদের জোর? একথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্বল করবি।

গণেশ। ওকথা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়। তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।

সকলে। কেন ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে? বড়ো লজ্জা পেলুম।

১। সে কী কথা ঠাকুর? আচ্ছা, যা করতে বল তাই করব।

ধনঞ্জয়। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যা।

২। চলে গিয়ে কী করব? তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে? আমাদের ভালোবাস না?

ধনঞ্জয়। ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে যা।

সকলে। আচ্ছা, ঠাকুর চললুম, কিন্তু—

ধনঞ্জয়। কিন্তু কী রে। একেবারে নিঃকিন্তু হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে।

সকলে। আচ্ছা, তবে চলি।

ধনঞ্জয়। ওকে চলা বলে? জোরে।

গণেশ। চললুম, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে। [প্রস্থান

রণজিৎ। কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে যে।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে, রাজা।

রণজিৎ। কিসের ভাবনা ?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি ; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেছি।

রণজিৎ। এমনটা হয় কী করে ?

ধনঞ্জয়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ। ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়। তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছোল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ। রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না ?

ধনঞ্জয়। ওরে বাপ রে। বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ। এখন তোমার কর্তব্য ?

ধনঞ্জয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ। তবে আর দেরি কেন ? সরো না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।

রণজিৎ। নিজে সরতে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখো।

ধনঞ্জয়। গান

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের ধরা আমায় ধরবে না।
যে-পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কী বল?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর ভয়ে পরান ভরবে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের প্রস্থান

রণজিৎ। মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিৎকে দেখে এস গে। যদি দেখ সে আপন কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত, তাহলে—

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিৎ। না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

[রাজার প্রস্থান

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। এ কী? যুবরাজের সঙ্গে দেখা না করেই মহারাজ চলে গেলেন?

মন্ত্রী। পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না। যাই যুবরাজকে দেখে আসি গে। [প্রস্থান

দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

১। মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে? কেন বলছে যুবরাজ অন্যায় করেছেন—আমি এ বুঝতেও পারি নে, সইতেও পারি নে।

২। বুঝতে পারিস নে উত্তরকূটের মেয়ে হয়ে? উনি নন্দিসংকটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

১। আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে যে যুবরাজ অন্যায় করেছেন।

২। তুই ছেলেমানুষ, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন বুঝবি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে বোধ হয় তাদেরই বেশি সন্দেহ করতে হয়।

১। কিন্তু যুবরাজকে কী সন্দেহ করছ তোমরা?

২। সবাই বলছে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে নিয়ে, উনি এখনই উত্তরকূটের সিংহাসন জয় করতে চান,—ওঁর আর তর সইছে না।

১। সিংহাসনের কী দরকার ছিল ওঁর। উনি তো সবারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। যারা ওঁর নিন্দে করছে তাদেরই বিশ্বাস করব আর যুবরাজকে বিশ্বাস করব না?

২। তুই চুপ কর্। একরত্তি মেয়ে, তোর মুখে এসব কথা সাজে না। দেশসুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত করছে তুই হঠাৎ তার—

১। আমি দেশসুদ্ধ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারি যে—

২। চুপ চুপ।

২। কেন চুপ? আমার চোখ ফেটে জল বেরোতে চায়। যুবরাজকে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যে আমার যা হয় একটা কিছু করতে ইচ্ছা করছে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানত করব—বলব, "বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তারা মিথ্যে।"

২। চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শুনতে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখছি। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

১। কিছুতেই ছাড়ছি নে, চল্ রাজার কাছে যাই।

২। ফল কী হবে? যুবরাজ যে রাজার বুকের মানিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের 'পরে।

১। করুন রাগ, স্পষ্ট কথা বলব কপালে যাই থাক।

৩। এদিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্তি? হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরকূটের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল?

১। এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম রইল কোথা? বলো তো দাদা?

৩। কাউকে চেনবার জো নেই।

১। রাজা ওঁকে শাস্তি না দেন তো আমরা দেব।

২। কী করবি?

১। এদেশে ওঁর ঠাঁই হচ্ছে না। যে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

৩। কিন্তু ওই তো চবুয়া গাঁয়ের লোক বললে, তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

১। রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েছে।

৩। লুকিয়েছে? ইস, দেয়াল ভেঙে বের করব।

১। ঘরে আগুন লাগিয়ে বের করব।

৩। আমাদের ফাঁকি দেবে? মরি মরব তবু—

উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কী হয়েছে?

১। লুকোচুরি চলবে না। বের করো যুবরাজকে।

মন্ত্রী। আরে বাপু, আমি বের করবার কে?

২। তোমরাই তো মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে—পারবে না কিন্তু, আমরা টেনে বের করব।

মন্ত্রী। আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।

৩। গারদ থেকে?

মন্ত্রী। মহারাজ তাকে বন্দী করেছেন।

সকলে। জয় মহারাজের, জয় উত্তরকূটের।

২। চল্ রে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী। গিয়ে কী করবি ?

২। বিভূতির গলায় মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে আসব।

৩। গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ-কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী। যুবরাজ পথ ভেঙেছেন বলে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে, তাতে অপরাধ নেই ?

২। আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি তো কী হবে ?

মন্ত্রী। পায়ের তলার মাটি পছন্দ হল না বলে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।

৩। আচ্ছা, তবে পারব থাক, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে আসি গে।

৩। ও ভাই, ওই দেখ্‌। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনও জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

২। আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কী রকম দেখাচ্ছে। [নাগরিকদের প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিলেন এখন বুঝেছি।

উদ্ধব। কেন ?

মন্ত্রী। প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভালো ঠেকছে না। লোকের উত্তেজনা কেবলই বেড়ে উঠছে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। মহারাজকে বেশি আগ্রহ দেখাতে সাহস করলুম না, তাতে তাঁর সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী। রাজকুমার, শান্ত থাকবেন, উৎপাতকে আরও জটিল করে তুলবেন না।

সঞ্জয়। বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী। তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধন মোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়। সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জানতুম যুবরাজকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে,—তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসংকটের খবর পেয়ে তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী। তবেই বুঝছেন, বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়। আমি চিরদিন তাঁরই অনুবর্তী, বন্দিশালাতেও আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী। কী হবে?

সঞ্জয়। পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আর-এক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী। রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়। মন্ত্রী, এ তো তোমার নিজের কথা বলে শোনাচ্ছে না, এ যেন যুবরাজের মুখের কথা।

মন্ত্রী। তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি আমার।

সঞ্জয়। কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ, দূর থেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী। কী করতে?

সঞ্জয়। শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী। সময় যে বড়ো সংকটের, এখন কি—

সঞ্জয়। সেইজন্যেই এই তো উপযুক্ত সময়। [উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বজিতের প্রবেশ

বিশ্বজিৎ। ও কে ও? উদ্ধব বুঝি?

উদ্ধব। হাঁ, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিৎ। অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েছ তো?

উদ্ধব। পেয়েছি।

বিশ্বজিৎ। সেই মতো কাজ হয়েছে?

উদ্ধব। অল্প পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিৎ। মনে সংশয় ক'রো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি একাজ সাধন করে তাহলে তিনি বেঁচে যাবেন।

উদ্ধব। কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিৎ। আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

নেপথ্যে। আগুন, আগুন।

উদ্ধব। ওই হয়েছে। বন্দিশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে বন্দী ছুটিকে বের করে দিই।

কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ

অভিজিৎ। এ কী দাদামশায় যে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।

অভিজিৎ। আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হ'ক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ। কেন, ভাই, কী তোমার কাজ?

অভিজিৎ। জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিৎ। তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ। সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ। আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ। না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিৎ। তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তাদের ডাকবে না?

অভিজিৎ। যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।

বিশ্বজিৎ। ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

অভিজিৎ। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।

[দুই জনের দুই পথে প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

গান

আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
মূর্তি দেখি নাই।
দুহাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে?
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়
বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে, ভাই,
আগল যাবে সরে
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে,
ঘুচবে সব বালাই।

বটুর প্রবেশ

বটু। ঠাকুর, দিন তো গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়। বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

বটু। ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিলে ?

ধনঞ্জয়। ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু। ভরসা দাও, প্রভু, বড়ো ভয় ধরিয়েছে।—জাগো, ভৈরব, জাগো। আলো নিবেছে, পথ ডুবেছে, সাড়া পাই নে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে। জাগো, ভৈরব, জাগো। [প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকদলের প্রবেশ

১। মিথ্যে কথা। রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেছে।

২। দেখব, কোথায় লুকিয়ে রাখে।

ধনঞ্জয়। না, বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১। এ আবার কে রে ? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চমকিয়ে দিলে।

৩। তা বেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা এই বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়। যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কী করে ?

১। সাধুগিরি রাখো, আমরা ও সব মানি নে।

ধনঞ্জয়। না মানাই তো ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে খোয়ালে। আমাকে সুদ্ধ তারা মানার তাড়ায় দেশছাড়া করেছে।

১। তাদের গুরু কে ?

ধনঞ্জয়। যার হাতে তারা মার খায়।

১। তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই শুরু করি না কেন ?

ধনঞ্জয়। রাজি আছি, বাবা। দেখে নিই ঠিকমতো পাঠ দিতে পারি কি না। পরীক্ষা হ'ক।

২। সন্দেহ হচ্ছে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকি করেছ।

ধনঞ্জয়। তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকি আমাকে নিয়ে।

২। দেখলি তো, কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা কী ফন্দি চলছে।

১। নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন ? যুবরাজকে শিবতরাইয়ে

সরাবার চেষ্টা। এইখানেই ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাঁধো না। দড়িগাছটা তো তোমার কাছেই আছে।

কুন্দন। এই নাও না দড়ি, তুমিই বাঁধো না।

২। ওরে, তোরা কি উত্তরকূটের মানুষ? দে, আমাকে দে। (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কী বলছেন?

ধনঞ্জয়। কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়ছেন না।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর,
শংকর শংকর। [প্রস্থান

কুন্দন। ওই দেখো চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

১। দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

কুন্দন। বিভূতি তার কীর্তিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।

চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ

৪। খবর পাওয়া গেল, ওই আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েছে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েছে।

২। এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে বৈরাগী এই পথেই ঘুরছে। ও থাক্ এইখানেই বাঁধা পড়ে। ততক্ষণ দেখে আসি। [নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়। গান

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,
গুণী মোর, ও গুণী?
বাঁধাবীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে,
গুণী মোর, ও গুণী?
তাহলে হার হল যে হার হল
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল
গুণী মোর, ও গুণী!
বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,
তাহলেই সুর জাগে,
গুণী মোর, ও গুণী।
না হলে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।

নাগরিকদের পুনঃপ্রবেশ

১। এ কী কাণ্ড?

২। খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীসুদ্ধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন। এর মানে কী হল?

কুন্দন। উত্তরকূটের রক্ত তো ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে গেছেন।

১। ভারি অন্যায়। একে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না?

২। এর উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে, দাদা—

১। হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন। আর জানিস তো, ভাই, ওঁর গোষ্ঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

১। তার সব কটি গুনে নিয়ে তবে—কী অন্যায়। অসহ্য অন্যায়।

৩। আর ওঁদের সেই জাফরানের খেত, তার থেকে অন্তত পক্ষে বৎসরে—

২। হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কী করা যায়?

১। ও ওইখানেই থাক্ না পড়ে। [নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়। গান

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? (ও অবোধ)
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ওযে কোন্ রতন তা দেখ্ না ভাবি,
ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার
হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।
ওর খোঁজ পড়েছে জানিস নে তা?
তাই দূত বেরোল হেথা সেথা।
যারে করলি হেলা সবাই মিলি,
আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,
যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি
সেই দরদির প্রাণে স'বে?

কুন্দনের পুনঃপ্রবেশ

কুন্দন। ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনই বাড়ি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়। কী জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজন্তেই তো বাড়ি পালাবার জো নাই।

কুন্দন। এখানে তোমার ডাক কোথায়?

ধনঞ্জয়। উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন। তুমি শিবতরাইয়ের মানুষ হয়ে উত্তরকূটের—

ধনঞ্জয়। ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

কুন্দন। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চললেম। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ

১। এখন কোন্ দিকে যাই? নওলাদুতে যারা ছাগল চরায় তারা তো বললে, তারা দেখেছে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

২। আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের হুকুম।

১। মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু অন্ধা পাগলীর কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে যাকে দেখেছে সে আমাদের যুবরাজ—আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন।

২। কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্ছে না।

১। আলো না হলে আমরা তো এক পা এগোতে পারব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে। [উভয়ের প্রস্থান

একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক (চীৎকার করিয়া)। ওরে বুধ—ন, শম্ভু—উ। বিপদে ফেললে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বললে, চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধরবে। কারও দেখা নেই। অন্ধকারে ওই কালো যন্ত্রটা ইশারা করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন না কি?

২ পথিক। আমি নিমকু, বাতিওআলা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জলবে, বাতির দরকার। তুমি কে?

১ পথিক। আমি হুব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল?

নিমকু। অনেক মানুষ আসছে, কাকে চিনব?

হুব্বা। অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধ'রো না, আমাদের আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ—ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না—সবাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ওই ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিমকু। দাম কত দেবে?

হুব্বা। দামই যদি দিতে পারতুম তবে তো তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে সুর বের করব কেন?

নিমকু। রসিক বট হে। [প্রস্থান

হুব্বা। বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়।—উঃ, ঝিঁঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিমঝিম করছে। নাঃ বাতিওআলার সঙ্গে রসিকতা না করে ডাকাতি করলে কাজে লাগত।

আর-একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। হেইয়ো!

হুব্বা। বাবা রে, চমকিয়ে দাও কেন?

পথিক। এখন চলো!

হুব্বা। চলব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কি রকম অচল হয়ে পড়তে হয় সেই তত্ত্বটা মনে মনে হজম করবার চেষ্টা করছি।

পথিক। দলের লোক তৈরি আছে এখন তুমি গিয়ে জুটলেই হবে।

হুব্বা। কথাটা কী বললে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যেস আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারি নে। দলের লোক বলছ কাকে?

পথিক। আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বদ অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি। (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝলে তো?

হুব্বা। উঃ বুঝেছি। ওর সোজা মানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মর্জি থাক আর না থাক। কোথায় চলব? এবার একটু মোলায়েম করে জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

পথিক। শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুব্বা। শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যারাত্রে? সেখানে পালাটা কিসের?

পথিক। নন্দিসংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হুব্বা। ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ না বলেই এত বড়ো শক্ত কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক। তুমি যেই হও না কেন, দুখানা হাত আছে তো?

হুব্বা। নেহাত না থাকলে নয় বলেই আছে নইলে একে কি—

পথিক। হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না, যথাস্থানেই হবে, এখন ওঠো।

দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ

২ পথিক। ওই আর-একজন লোককে পেয়েছি কঙ্কর।

কঙ্কর। লোকটা কে?

৩। আমি কেউ না, বাবা, আমি লছমন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কঙ্কর। সে তো ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চলো শিবতরাই।

লছমন। যাব তো, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কঙ্কর। বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছমন। দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভুগছে।

কঙ্কর। তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে, নয় সে মরবে; তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

হুব্বা। ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই, আমি একটু আভাস পেয়েছি।

কঙ্কর। ওই যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্ছে। কী নরসিং খবর ভালো তো।

কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ

নরসিং। এই দেখো, দল জুটিয়ে এনেছি। আরও কয়দল আগেই রওনা হয়েছে।

কঙ্কর। তা হলে চলো, পথের মধ্যে আরও কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন। আমি যাব না।

কঙ্কর। কেন যাবে না? কী হয়েছে?

উক্ত ব্যক্তি। কিছু হয় নি, আমি যাব না।

কঙ্কর। লোকটার নাম কী, নরসিং?

নরসিং। ওর নাম বনোয়ারি, পদ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর। আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই—কেন যাবে না বলো তো?

বনোয়ারি। প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কঙ্কর। আচ্ছা, না হয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তারও তো একটা কর্তব্য আছে?

বনোয়ারি। আমি অন্যায় করতে পারব না।

কঙ্কর। ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য যেখানে সেইখানেই অন্যায় হচ্ছে অন্যায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি। উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরকূটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কঙ্কর। ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই।

নরসিং। শক্ত কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি।

বনোয়ারি। তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকব, কোনো কাজে লাগব না।

কঙ্কর। উত্তরকূটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জন করবার উপায় খুঁজছি।

ছব্বা। বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে সব কথা বুঝতে চাও বলেই, যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রণালীটা কায়দা করে নাও, নয় নিজের প্রণালীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকো।

বনোয়ারি। তোমার প্রণালীটা কী।

ছব্বা। আমি গান গাই। সেটা এখানে খাটবে না বলেই সুর বের করছি নে— নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কঙ্কর। (বনোয়ারির প্রতি) এখন তোমার অভিপ্রায় কী?

বনোয়ারি। আমি এক পা নড়ব না।

কঙ্কর। তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে।

ছব্বা। একটা কথা বলি, কঙ্কর দাদা, রাগ ক'রো না। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যে জোরটা খরচ করবে সেইটে বাঁচাতে পারলে কাজে লাগত।

কঙ্কর। উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।

ছব্বা। এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছি। [নরসিং ও কঙ্কর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

নরসিং। ওই যে বিভূতি আসছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

বিভূতির প্রবেশ

কঙ্কর। কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিয়ে সবাই যে উৎসব করবে।

বিভূতি। উৎসবে আমার শখ নেই।

নরসিং। কেন বলো তো?

বিভূতি। আমার কীর্তি খর্ব করবার জন্যেই নন্দিসংকটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌঁছোল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চলছে।

কঙ্কর। কার প্রতিযোগিতা, যন্ত্ররাজ?

বিভূতি। নাম করতে চাই নে, সবাই জান। উত্তরকূটে তাঁর বেশি আদর হবে, না আমার, এই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই; এর মধ্যে

আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে ; আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসনবাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিং। এত বড়ো কথা ?

কঙ্কর। তুমি সহ্য করলে, বিভূতি ?

বিভূতি। প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কঙ্কর। কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো ? তুমিই তো বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্প একটুখানিতেই—

বিভূতি। সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র খুলতে গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিং। পাহারা রাখলে ভালো করতে না ?

বিভূতি। সে ছিদ্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন। বাঁধের জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত ওই নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কঙ্কর। তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভূতি। না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুশকিল এই যে, ওই গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং। বাধা কত দেবে ? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভূতি। মরবার লোক বিস্তর চাই।

কঙ্কর। মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

কঙ্কর। ওই দেখো, যাবার মুখে অযাত্রা।

বিভূতি। বৈরাগী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমি ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনঞ্জয়। সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জ্বালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়। না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্যে জাগবেন।

বিভূতি। সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়। সব চেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনই তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েছে। অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা তো—

রণজিৎ। তারা যেখানেই থাক না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই।

কম্বর। মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবি করি।

রণজিৎ। শাস্তির যে যোগ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে থাকি?

কম্বর। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

রণজিৎ। কী! সংশয়! কার সম্বন্ধে?

কম্বর। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য এত বেড়ে উঠছে যে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জন্যে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ। আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না?

বিভূতি। যেটা আপনারই বংশের অপকীর্তি, তাতে আপনারও গোপন সম্মতি আছে এ রকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী। মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন একদিকে আত্মশ্লাঘায় অন্যদিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্যের দ্বারা অধৈর্যকে উদ্দাম করে তুলবেন না।

রণজিৎ। ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়। বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখছি।

রণজিৎ। যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারি নে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিৎ। তবে এখানে কী করছ?

ধনঞ্জয়। যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে। সুমন, বাবা সুমন। অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা। ও কে ও?

মন্ত্রী। সেই অম্বা পাগলী।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। কই, সে তো ফিরল না।

রণজিৎ। কেন খুঁজছ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অম্বা। ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি? গভীর রাত্রে?—সুমন, সুমন। [প্রস্থান

চরের প্রবেশ

চর। শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।

বিভূতি। সে কী কথা? আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরস্ত্র করব এই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েছে। কঙ্কর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তাহলে কী করে—

কঙ্কর। কী বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর না কি?

বিভূতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

কঙ্কর। তাহলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভূতি। সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হ'ক সময় হলে এর একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।

রণজিৎ। (চরের প্রতি) তারা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জান?

চর। তারা শুনেছে—যুবরাজ বন্দী হয়েছেন, তাই পণ করেছে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এখান থেকে মুক্ত করে তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।

বিভূতি। আমরাও খুঁজছি যুবরাজকে, আর ওরাও খুঁজছে, দেখি কার হাতে পড়েন।

ধনঞ্জয়। তোমাদের দুই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই।

চর। ওই যে আসছে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দার।

গণেশের প্রবেশ

গণেশ (ধনঞ্জয়ের প্রতি)। ঠাকুর, পাব তো তাঁকে?

ধনঞ্জয়। হাঁ রে, পাবি।

গণেশ। নিশ্চয় করে বলো।

ধনঞ্জয়। পাবি রে।

রণজিৎ। কাকে খুঁজছিস?

গণেশ। এই যে রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিৎ। কাকে রে?

গণেশ। আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে রাখবে? ওকেও?

ধনঞ্জয়। মানুষ চিনলি নে, বোকা? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার?

গণেশ। ওকে আমাদের রাজা করে রাখব।

ধনঞ্জয়। রাখবি বই কি। ও রাজবেশ পরে আসবে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর, শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

নেপথ্যে। মা ডাকে, মা ডাকে। ফিরে আয়, সুমন ফিরে আয়।

বিভূতি। ও কী শুনি? ও কিসের শব্দ?

ধনঞ্জয়। অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল খিল করে হেসে উঠল যে।

বিভূতি। আঃ থামো না, শব্দটা কোন্ দিকে বলো তো?

নেপথ্যে। জয় হ'ক, ভৈরব।

বিভূতি। এ তো স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।

ধনঞ্জয়। নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।

বিভূতি। শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে।

কঙ্কর। এ যেন—

নরসিং। বোধ হচ্ছে যেন—

বিভূতি। হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে?—তার নিস্তার নেই। [কঙ্কর, নরসিং ও বিভূতির দ্রুত প্রস্থান

রণজিৎ। মন্ত্রী, এ কী কাণ্ড?

ধনঞ্জয়। বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।

গান

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।

মন্ত্রী। মহারাজ এ যেন—

রণজিৎ। হাঁ, এ যেন তাঁরই—

মন্ত্রী। তিনি ছাড়া আর তো কারও—

রণজিৎ। এমন সাহস আর কার?

ধনঞ্জয়। গান

নাচে রে নাচে চরণ নাচে,
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিৎ। শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এইসব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।

গণেশ। প্রভু, ব্যাপার কী হল কিছু তো বুঝতে পারছি নে।

ধনঞ্জয়। গান

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,

তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

রণজিৎ। ওই পায়ের শব্দ শুনছি যেন। অভিজিৎ, অভিজিৎ।

মন্ত্রী। ওই যেন আসছেন।

ধনঞ্জয়। গান

মরমে মরমে বেদনা ফুটে,

বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ। এ যে সঞ্জয়। অভিজিৎ কোথায়?

সঞ্জয়। মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।

রণজিৎ। কি বলছ, কুমার।

সঞ্জয়। যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।

রণজিৎ। বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন?

সঞ্জয়। না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ওইখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ওই পর্যন্ত—বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্যন্ত যেতে দিলেন না।

রণজিৎ। কী হল আর-একটু বলো।

সঞ্জয়। ওই বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

গণেশ। যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে তাঁকে কি আর পাব না।

ধনঞ্জয়। চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,

জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।

জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর।
তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নি নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শংকর, শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর।

পৌষসংক্রান্তি, ১৩২৮
শান্তিনিকেতন

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরু-পল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নিচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ওই বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোনার মতো রং, চাঁপা ফুলের মতো রং। রৌদ্রের এমন রং আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে

হয়; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গঙ্গার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়, বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এইজন্য সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতাগুল্মশৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ওই যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়ো হইল, বালিকারা জল ছুড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কৌতুক বোধ হইত।

যে-কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি

না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই মৃতকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন ডোবে কখন ভোবে। পাতাটুকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ওই গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ওইখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইঁটের অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত, মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপুচ্ছ দুই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপর পা ফেলিত ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন

আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশি খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুশি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুসমি। যখন তখন দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম তাহাদের কুসি-খুশি-রাক্কুসিকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কারা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি, নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুসুমের কথা একরকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝরঝর করিয়া বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দুই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-খুশি-রাক্কুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন

বসন করুণ মুখ শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুসুম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনো দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমন একদিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্যসত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের সুখদুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি—তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতে ছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বলমুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ওই শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননী-দিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ

মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত—আহা কী রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পুটের মতো ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ-সরোবরে উষাকুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য পূর্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী। স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজূট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্যকিরণ তাঁহার সর্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে সূর্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেক-গুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-এক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলো, এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী।"

আর-একজন দুই আঙুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, তাইতো গা, এ যে আমাদের চাটুজ্যেদের বাড়ির ছোটোদাদাবাবু।"

আর একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না, সে কহিল, "আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ।"

আর-একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি তেমনি কপাল।"

তখন কেহ কহিল, "তার এত দাড়ি ছিল না।"

কেহ বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।"

কেহ কহিল, "সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এইরূপে এ-কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁঝি পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল। মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল ছল করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসুমের পশ্চাতে আশে পাশে ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের ঊর্ধ্ব-চীৎকার ধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। ঊর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

কুসুম কহিল, "আমার নাম কুসুম।"

সে-রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল, কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে-রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আলস্য করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্ন্যাসী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পূজার ফুলের মতো দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল, "প্রভু, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন।"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, "প্রভু, আমি পাপীয়সী সেইজন্যই এই অবহেলা।"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

কুসুম যেন চমকিয়া উঠিল—সে হয়তো মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন। তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল ; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছুদূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো , আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।"

কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙিল না। তাহার পরদিন যখন তাঁহাকে দেখিলাম আর পূর্বের মতো দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না—আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।"

যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়া ছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুসুম জোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বলো।"

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পীড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "হাঁ বলিতেই হইবে।"

কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি।"

যেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে মূর্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন মূর্ছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "প্রভু, তাহাই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কার্তিক, ১২৯১

রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্যের সহিত ধুলায় লুটাইয়া শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে, আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ; কেবলই পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়-নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন আমি কান পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙা কথা ভাঙা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়। ওই শুন, এক জন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা

গেল না। ওই একটিমাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কানে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জানি। যে কথাটা বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে। এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায়, সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পুণ্যস্তূপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহবাতায়ন হইতে, মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া সূর্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একটুখানি পাইব না!

কখনো কখনো তাহাও পাই। বালকবালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয়

লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা।

অরুণ-চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না।

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মূর্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহুদিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে বহুদূর হইতে আসিত—ছোটো দুটি নূপুর রুনু ঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো ম্লানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ওই বাঁধানো বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্যমনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাঁড়াইত না,—হয়তো বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে-পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার হিমস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধূলির কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা আর কেহ বড়ো চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝরঝর ঝরঝর শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্রমুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর একজন যে আসে সে আর আসিল না। সেদিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল

আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ণে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেদিনও আর একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে। তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন। তুই যাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মূক। তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ।

বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে—হয়তো সে কাহাকেও কোনো দুঃখের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত যায়।

কী প্রখর রৌদ্র। উহু-হুহু। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্ত ধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা-পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়। না না, বৃথা চেষ্টা। আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

অগ্রহায়ণ, ১২৯১

মুকুট

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন, "দেখো, সেনাপতি, আমি বারবার বলিতেছি তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।"

পাঠান ইশা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক, তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, "হাঁ।"

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক ফুলানোর ভঙ্গি ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না—হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। হজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন, "বস্। চুপ। আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।" বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"শোনো তো বাবা, বড়ো তামাশার কথা।

তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজ চক্রবর্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উঁহার অপমান বোধ হয়।" বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি।" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা। হা হা হা হা।"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করো বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, "জনাব।"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্। আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ইশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "উঁহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না।"

রাজধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝনঝন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ইঁহার তেমন ছিল না। ইঁহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটীর চাকরবাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতজোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে-বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ

চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রুপার পাত লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন—ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, "দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও-হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।" কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, "ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।"

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ঈশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ঈশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।"

"মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম, রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।"

রাজধর বলিলেন, "আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।"

ঈশা খাঁ বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুনশির মতো কলম চালাইতে পারিবে—আর কোনো কাজে লাগিবে না।"

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঈশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে। এই তো রাজপুত্র বটে।"

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?"

রাজধর বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নিচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই—তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বুদ্ধি তীরের মতো—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। যে-জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে—আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল? এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারি নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে—ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে, তাহার মর্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মান্য করিতেন না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন—মৃদুভাবে বলিলেন, "দাদা তোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।"

ইশা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন—সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়—যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে।"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে, উহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী। চলো তার আয়োজন করি গে।"

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন, "ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো। একেবারে তীরধনুক বর্মচর্ম লইয়া যে। আমাকে মারিবে নাকি।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও যাইবে না কি। আজ তিন ভাই একত্র হইবে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না—রোজ-রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর বলিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার।"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কখনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখো।"

কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় লুকাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়, সে বড়ো রঙ্গ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এস, অস্ত্রশালায় এস" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।"

এদিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই।" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ।" ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না—আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলাদেবী কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে। আমার একটা কথা যদি রাখ তো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "সে হয় না—এ-কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ। একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি।

ইন্দ্রকুমার। কই, মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ?

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এস, দেখো'সে।" বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"এ কী, রাজধর অস্ত্রশালায় যে।"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন, "তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।" রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতিধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল—কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল।"

কমলাদেবী বলিলেন, "না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, "দাদা, আজ শিকারের সুবিধা হইল না।" চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটির বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোকে ঝকঝক করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচুনিচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-এক-জনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে-ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সেদিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন একহাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—দইওআলা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, "ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বই তো নয়।" দইওআলা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের 'পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল—চারিদিকে চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল। আটায় প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে-ব্যক্তি মুখচক্ষু লাল করিয়া চটিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো ঊর্ধ্বমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারি গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা

করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ইশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কী। আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎ সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত, তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি হার তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমানুষি করিয়ো না— ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুইশত হাত দূরে গোটাপাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচক্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেদিকে লক্ষ্য স্থাপিত, সেদিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইশা খাঁ তাঁহার গোঁফসুদ্ধ দাড়িসুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন—পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইশা খাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইশা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বুদ্ধি আর-সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না, তার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইশা খাঁ বুঝিতে পারিয়া

দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ঈশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে—আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন, "হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ঈশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্যায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। ঈশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, "পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত—আর যে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত।

রাজধর কহিলেন, "বিচার করুন মহারাজ।"

ইশা খাঁ কহিলেন, "নিশ্চয়ই তূণ বদল হইয়াছে।"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ বলিলেন, "পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, "তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যম' কুমার বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক।" বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্। তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।" বলিয়া তলোয়ারখানা ঝনঝন করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ করুন।"

ইশা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষণ্ণ হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "পুত্র, এ কী পুত্র। আমার 'পরে এই ব্যবহার। তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস।"

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, "শান্ত হও ভাই—গৃহে ফিরিয়া চলো।"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন।" গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষা-দিনের পূর্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়া ছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত একটি তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেইজন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না—কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে-সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন-শ বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এইজন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ওপারে কতক এপারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখাসমুখি দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারিদিকে হরীতকী আমলকী শাল ও

গাম্ভারির বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়িরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্য বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, "দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্‌, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "রাজধর তফাতে থাকিতে চান।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।" ঈশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিন সমস্ত দিন নিষ্ফল যুদ্ধ অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল—যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরের স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্তপদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দি নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি

নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতিসাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নিচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনই উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতিকষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেইজন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন। তিনি তো সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানেই অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে, তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নিচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্তনির্মিত মুকুট, পাঁচশত মণিপুরী ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন, এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা

হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারিদিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সূর্যালোকে সহস্রচক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়—শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্য সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন—তিনি বলিতেছিলেন—আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই আর ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয় জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।" এই বলিয়া হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিনা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হর হর বোম্ বোম্।" যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বামদিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যগণ সহসা এরূপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল।

তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ আসমসাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপ বার বার তূরীনিনাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বলিলেন, "তাঁহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।" ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুখ হইয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অশ্বারোহী সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পালাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুদ্‌বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন। কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনই পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল— আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগদের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ? যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে। এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি; এ মুকুট আমি পরিব।"

যুবরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ইশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পালাইলে এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "খাঁ সাহেব, এখন তো তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে—কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণ থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কী, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম—নিজে পারিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম—তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না। তুমি কি না বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই—আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কি কখনো ভীরুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শত্রু-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ঈশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ঈশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ঈশা খাঁ বলিলেন, "তবে থাক্‌। এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন—রাজধর শাস্তির যোগ্য।"

দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ঈশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন, তখন রাজধর মনে মনে কহিলেন, "আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।"

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকান-পতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছে, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগ-সৈন্য কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ঈশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "পালাইব বা কোথা। এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পালাইবার তেমন সুবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

ঈশা খাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।" বলিয়া

প্রাচীরবৎ শত্রুসৈন্যের এক দুর্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পালাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন—তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের একস্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ শত্রুর ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের জানুতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে তিনি যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাত্রে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাতপা কাটামুণ্ড ও মৃতদেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ—তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল, অস্ত্রের ঝন ঝন উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্তনাদ অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতেছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি কী সুগভীর বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারিদিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। একদিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে—একদিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখাপ্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া আসিতেছে। দূর সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল কুল করিয়া নদীর জল বহিয়া আসিতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারিদিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে, বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণহৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশপাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এস ভাই" বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণে কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।" বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল—মৃদুস্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাতজোড় করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল।

পরিশিষ্ট

বিজয়ী মগ সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন—জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

৪

পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্ত লাভের কথা বলে না।

এইজন্য ধর্মনীতিই তাদের শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিস—তা পথের পাথেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে—তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ যে গৃহে কোনোকালেই মানুষ পৌঁছোবে না, সে গৃহকে মানলেও হয়, না মানলেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত উন্নতি তাকে উন্নতি না বললে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ—কারণ তাতে শক্তির চালনা হয়; লাভে শক্তির কর্ম শেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে; বস্তুতঃ ঐশ্বর্য-পদার্থের গৌরবই এই যে সে আমাদের কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাখে না, সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশ্বর্য আমাদের থামতে দেয় না;—কিন্তু দুর্গতির পূর্বে দেখতে পাই মানুষ বলতে থাকে, এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আমি পেয়েছি। তখন পথিকধর্ম সে বিসর্জন দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে—তখন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কী করলে আটেঘাটে বাঁধা যায় রক্ষা করা যায়, সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিসটা যে কেবলই সরে, কেবলই সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো, নয় মরতে থাকো। এখানে যে বলেছে আমার যথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধব, সেই ডুবেছে।

ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে—এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব;—তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস

করে না—তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্মনীতিকে দুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয় সে কারও অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি, পরিণাম কোথাও নেই এমন একটা অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। এ-কথা ঐশ্বর্য-গর্বের উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু এ-কথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনোই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বলতে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পন্থা আছে। সে হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে আমরা তাঁকে পাই কেন, না তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তো সে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চত্বলাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হই নে। তার কারণ আমরা পূর্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না—বরঞ্চ তার চেষ্টা আরও গভীররূপে জাগ্রত হয়।

এইজন্যে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন—এই ধরা দেওয়ার দরুন তিনি আমাদের কাছে ছোটো হয়ে যান না—তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্য নূতন থাকে।

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না—এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কী বলব? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন

ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনোকালেই আর ভয় পান না।

অতএব মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্? সেইজন্যে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করেছিলেন।

সেদিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড়ো বলে তো বোধ হয় না। তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্য কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে বড়ো করে সফল হয়—আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্য দীন যে সে সেখানে ধন্য। যে অহংকার করবার কিছুই রাখে নি সেই ধন্য—কেননা, ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেখানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্যেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি, "নমস্তেঽস্তু"—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতি-খচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্তলোক।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয়দান।

২৫ পৌষ

সমগ্র

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের সবদিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে—সৌন্দর্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করছে। এই

ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্তে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূত পাঠান নি—তাঁর একই দূত সকল পথেরই দূত হয়ে হাস্তমুখে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে সত্যকে আমরা একমুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে। প্রথম খণ্ড খণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে—তদনুসারে দূরকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্তে নিকটকে বড়ো করে ও দূরকে ছোটো করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ংকর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখছিলুম। এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটিকে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা সারা হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভুল সংশোধনের সময় আসে। তখন পুনর্বার এই দুটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তাহলে বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাষা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটাকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে

হচ্ছে। এমন কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে সে একচক্ষু হরিণের মতো জানত না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

এ-কথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার স্বপ্নে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাহলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্যদিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয়, তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত;—সেই মূল বন্ধনটি বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে, হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে।

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, আত্মা মরুক আমি থাকি, আত্মা বলে প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয় পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ, এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী।

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্তবন্ধুর বন্ধুত্বসূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি।

২৬ পৌষ

কর্ম

আমাদের দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া, একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম।

যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্মের দ্বারা বদ্ধ?

একদিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর একদিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়শার জালের মতো শামুকের খোলার মতো তাঁর নিজেকে বদ্ধ করছে একথাও বলা চলে না।

এই জন্যই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বলছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম দুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এই জন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেই জন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যে তিনি আনন্দ এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়-বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করে না। শুধু বদ্ধ করে না তা নয় সেই কর্মই আমাদের মুক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম কখন বন্ধন? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে তবে সেই বিনাবেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ংকর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্‌টা হবে? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হ'ক আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য, সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তাহলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে

দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—মৃত্যুং তীর্ত্বা—অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিঃশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন, তিনি—যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তাহলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন—কারণ কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না আনন্দ-সাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব—এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ—কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত। জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত হব না।

২৭ পৌষ

শক্তি

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সংগত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘটলেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্যে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি দ্বারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তাহলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জন করে নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠব তাহলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের দুঃখের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তবেই বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্মে। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংযম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মানতে হয়—সেই স্বীকারের দ্বারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে।

এই কারণেই বলছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি—কর্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্মের চেয়ে বড়ো হতে পারি। পরিত্যাগ করে, পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ওঁ; অর্থাৎ তিনি হাঁ।

এইজন্য ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

শুনেছি এঁর পরমা শক্তি এবং এঁর বিবিধা শক্তি এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাচ্ছে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মুক্ত—কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি, কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্তিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে, যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা স্বার্থপর, জগৎসংসার তার সত্রম কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানছে এবং এই পরিশ্রমের ফলকে সে

যে চিরদিনের মতো আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই ; এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্মই করি—তা ছোটোই হ'ক আর বড়োই হ'ক সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম সত্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।

২৮ পৌষ

প্রাণ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ

ব্রহ্মবিদদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।

এই শ্লোকটির প্রথমার্ধটুকু তুললেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন—এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তো শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন ? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে "ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে ? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা, স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম, নিজেকে কেমন করে বলছেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পন্দিত করে ঝংকৃত করে তিনি বলছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃতসংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বলবেন তখন আর কেমন করে বলবেন? তাঁকে কর্মের দ্বারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম? না, যে কর্মদ্বারা প্রকাশ পায় তিনি "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরব বিস্তারে নয়। তিনি যে "নাতিবাদী"—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত করে তুলছেন—শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব সুন্দর আবর্তন চলছে এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গল-লোকের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠছে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে অর্থাৎ একইকালে আনন্দ ও কর্মরূপে প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—কর্ম সংগীতে বাজতে থাকুক—তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় তো সেও ভালো কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার সুর প্রবল হ'ক, গভীর হ'ক, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ক—হে আবি তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হ'ক।

২৯ পৌষ

১৪।২০

জগতে মুক্তি

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের, অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো সে-কথাও নানা রূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একইকালে একটি নির্গুণ দিক এবং একটি সগুণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্যে থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অখণ্ড নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করি নি। তখন মনে হয়েছে, জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে কিন্তু বিধান নেই। যখন তখন যা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরফা হচ্ছে যে আমার দিক থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ—সমস্ত রাস্তাই হচ্ছে তার দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলই সকলের হাতে পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বলতে হয় তুমি দয়া করে জ্বলো, বাতাসকে বলতে হয় তুমি দয়া করে বও, সূর্যকে বলতে হয় তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না।

ভয় কিছুতেই ঘোচে না। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ—যেখানে

ব্যবস্থা দেখতে পাই নে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবি নেই, সেটা একেবারেই একতরফা জিনিস।

অথচ যার সঙ্গে এতবড়ো কারবার তার সঙ্গে মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও তো কোনো নিয়ম থাকতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যে রকমই তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়, সেই তুকতাক যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই তো বোঝাতে হয়। কাজেই মানুষ মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এ রকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ি থাকা। সেও আবার এমন পর যে খামখেয়ালিতার অবতার। হয়তো পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয়তো হঠাৎ হুকুম হল আজই এখনই ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে।

এই রকম জগতে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়—কারণ, পালিয়ে যাব কোথায়? মরবার পথও যে এ আগলে বসে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে—যখন দেখে কার্যকারণের কোথাও ছেদ নেই তখন সে মুক্তিলাভ করে।

কেননা, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারই। তার নিজের যে আলোক সর্বত্রই সেই আলোক। এমন কি, সর্বত্রই সেই আলোক অখণ্ডরূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোথায় থাকত।

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলে। সে আর তো বাধা পেল না। সে বলল, আঃ বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি—এ যে আমার পিতৃভবন। আর তো আমাকে সংকুচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না। এতদিন স্বপ্ন দেখছিলুম যেন কোন্ পাগলাগারদে আছি—আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা বসে আছেন, সমস্তই আমার আপনার।

এই তো হল জ্ঞানের মুক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়—নিজেরই কল্পনা থেকে।

কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজের শিকল ছিন্ন ভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন সেই পরিচয়ের উপরেই তো চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি নে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান প্রদান করবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়—কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তখন শক্তিযোগে কর্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দ্বারা সে নিজেকে দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বন্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয় ঘরে নিয়তই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বই হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্মই হতে পারবে না।

তা কী করা যাবে? নিন্দাই কর আর যাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্ছেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেইজন্যেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্বতীর মতো তিনি তপস্যা করছেন।

জ্ঞান যে দিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন তখনই আমাদের শক্তি সতী হন—তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয়—তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জন যেমন তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্যই বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম, জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই তো তাকে মুক্তি বলব—নির্গুণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

১ মাঘ

সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয় সমাজপ্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে—মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় ততখানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানবহৃদয়ের কারাগার বলতে হয়—সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওআলা কারখানা বলে মানতে হয়—ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এই রকম অত্যন্ত প্রয়োজনওআলা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে তো কৃপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মূর্তি দেখেই তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে—সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কী। আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশ-বিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই—আমি বনে গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাকব!

কিন্তু বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে তখন এতবড়ো স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে? প্রেমে। যখনই জানব প্রয়োজনই মানবসমাজের মূলগত নয়—প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়—তখনই এক মুহূর্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। তখনই বলে উঠব—প্রেম! আঃ

বাঁচা গেল। তবে আর কথা নেই। কেননা, প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব-সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।—যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই তো গেল মুক্তি। তার পরে; তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মুক্তির পরিণাম।

যে মুক্ত তার তো ওজর নেই। সে তো বলতে পারবে না, আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে। কাজেই যেখান থেকে ডাক পড়ে তার আর না বলবার জো নেই। মুক্তির এত বড়ো দায়। আনন্দের দায়ের মতো দায় আর কোথায় আছে।

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায় মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্যে সে কাঁদছে। সে বলছে হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে। যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই ততদিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি। আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি। যখনই স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি তুমি পরম আমি আছ—আমার আমি তারই জোরে আমি—তখনই এক মুহূর্তে মুক্তিলাভ করি। কিন্তু শুধু তো মুক্তিলাভ নয়। তার পরে পরম অধীনতা। পরম আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

১ মাঘ

মত

আত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আত্মা শরীরের চেয়ে বড়ো। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত তাহলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এই জন্যে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মানুষের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, সুতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ।

এই জন্যে সত্যকে বারংবার মতদেহ পরিবর্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে তখন তার মৃত্যুর সময় আসে; তখন তার নানাপ্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা যে কোনো একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতিক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জন্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনায় আমরা ভীত ও পীড়িত হই নে—সেই রকম, মানুষ যে সকল মহৎ সত্যকে নানা দেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে এক-একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতন্ত্র করে সত্য আত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তাহলেই সত্যের অমৃতস্বরূপ জানতে পেরে আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলই মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অন্যের মত খণ্ডন করব এই অহংকার সুতীব্র হয়ে উঠে জগতে পীড়ার সৃষ্টি করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে সত্যকে যতই দূরে ফেলতে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই

কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নিষ্ঠুর ও মতের উন্মত্ততা যেমন উদ্দাম এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমাদের ধৈর্যদান করে কিন্তু মত আমাদের ধৈর্যহরণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর একদিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত এক-ঘরে করতে চান।

যাঁরা "অদ্বৈতম্‌" এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন? মিথ্যা কি নেই? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত? আমরা কি এককে আর বলে জানি নে? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিদ্যাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সত্যের জ্ঞান জ্বলছে না? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু এই মিথ্যা কি ব্রহ্মে আছে?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যে একেবারে পর্যবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্তনপরম্পরারূপে চলেছে, কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। এক জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরিসমাপ্তি না থাকে তবে আমরা এই যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বলছি একে অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাৎপর্য থাকত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনন্তকে প্রকাশও করছে একদিকে আচ্ছন্নও করছে। যেদিকে আচ্ছন্ন করছে সেদিকে তাকে কী বলব? তাকে মায়া বলব না কি, মিথ্যা বলব না কি? তবে "মিথ্যা" শব্দটার স্থান কোথায়?

যিনি খণ্ড কালের সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিমুক্ত হয়ে অনন্ত পরিসমাপ্তির নির্বিকার নিরঞ্জন অতলস্পর্শ মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই শুভ্র শান্ত গভীর অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল

স্থিতিলাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাই নে।

কেননা, আমি যে অনুভব করছি, মিথ্যার বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে "আমি" বলে ঠিক করে বসে আছি, তারই থালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি—যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেলতে পারি নে। অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। মিথ্যার বস্তাকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না—তাহলে তোমার "মহতী বিনষ্টিঃ"।

নিজের অহংকারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, খ্যাতি-প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই যদি হয় তবে এই মিথ্যার সীমা কোথায় টানব? বুদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভুল জানছি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎ-সম্বন্ধেও আমাদের ভোলাচ্ছে না? সেই ভ্রমই কি আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার "আমি"টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না? তাই, ইচ্ছা কি করে না, এই মাকড়সার জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমাত্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহংকারের সমস্ত আবরণ-বিবর্জিত হয়ে অবগাহন করি—ভারমুক্ত হয়ে, বাসনামুক্ত হয়ে, মলিনতামুক্ত হয়ে একেবারে সুবৃহৎ পরিত্রাণ লাভ করি।

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝখানে পথভ্রষ্ট বালকের মতো থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। তবে আমি মায়াবাদকে গাল দেব কোন্ মুখে। আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

২ মাঘ

নির্বিশেষ

সংসার পদার্থটা আলো-আঁধার ভালোমন্দ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের নিকেতন এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এই দ্বন্দ্বের দ্বারাই সমস্ত খণ্ডিত। আকর্ষণ-শক্তি বিপ্রকর্ষণ-শক্তি, কেন্দ্রানুগ শক্তি কেন্দ্রাতিগ শক্তি কেবলই বিরুদ্ধতা দ্বারাই সৃষ্টিকে জাগ্রত করে রেখেছে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত সত্য হত তাহলে জগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখতুম—শান্তিকে কোথাও কিছুমাত্র দেখতুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপরে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। তার কারণ এই বিরোধ সংসারেই আছে ব্রহ্মে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনন্তকাল অন্ধকারই থাকবে—কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এই প্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। সুখকে সোজা লাইনে টানতে গেলে সে দুঃখে এসে বেঁকে দাঁড়ায়—ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অখণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্বদিকের পূর্বত্ব নেই—পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্বপশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করেই আছে।

এই যে জিনিসটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে তাকে কী নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন—অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যখনই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাই তখনই একে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক থেকে দেখতে গেলেই এ সমস্তই অখণ্ড গোলকে অনন্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখতে গেলেই বিরোধের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে বহুর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্য যাঁরা সেই অখণ্ড অদ্বৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই যে অদ্বৈতের বিরাট সাধনা, ছোটো বড়ো নানা মাত্রায় মানুষ এতে প্রবৃত্ত আছে। একেই মানুষ মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মানুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জানত। তারপরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মানুষ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মানুষ অহংকারকে যখন একান্ত বিশেষ করে জানে তখন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্মই করতে পারে। মানুষের ধর্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে তোমার আমি একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চলো।

এই অতিবিশেষের অভিমুখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে যাই তাহলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—তার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তখন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অ-টাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারি নে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষের মধ্যে বড়ো বড়ো ভাব, মঙ্গল ভাব, ধর্মভাব কত রকম করে কাজ করছে। বড়োর মধ্যে ছোটোর বিশেষত্বগুলি নিজের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করে, এই জন্যে বড়োর মধ্যে বিশেষের দৌরাত্ম্য কম পড়াতে মানুষ বড়ো ভাবের আনন্দে ছোটোর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।

অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। সুতরাং মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্ধব্যক্তভাবে যে-সত্য কাজ করছিল, সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাঁরই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যেখানেই হ'ক বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিথ্যাই বলি মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর, সে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে ?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি (তাকে শয়তান বল বা আর কোনো নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে ? সে তো কোনোমতে মনেও করতে পারি নে।

উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ; ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এ সমস্ত যা কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্বিশেষে আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছোনো যায় অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই—আর সে আমাদের বদ্ধ করতে

পারে না। কর্ম তখন আনন্দের কর্ম হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বেঁচে যায়—সংসার তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কর্মই তখন চরম হয় না, সংসারই তখন চরম হয় না, আনন্দই তখন চরম হয়।

এমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিয়ে আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে দেয়।

৩ মাঘ

দুই

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এই ভাবে শুনে আসছি—

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না—সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনা-প্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখতে পেতুম। তিনি সর্বব্যাপী—এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—স পর্যগাৎ; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞাগুলি শুক্রম্ অকায়ম্ প্রভৃতি বিশেষণ-পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুক্রম্ অকায়ম এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ কবির্মনীষী প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের শরীর নেই এই পর্যন্তই সহ্য করা যায় কিন্তু ব্রণ নেই স্নায়ু নেই বললে এক তো বাহুল্য বলা হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে ; করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্তে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্‌ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারি নি।

আমি সেজন্তে অনুতপ্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিসকে তখনই লাভ করা সৌভাগ্য যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাই নি যে এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে পর্যগাৎ—তিনি সর্বত্রই গিয়েছেন সর্বত্রই আছেন। আর একটি হচ্ছে ব্যদধাৎ—তিনি সমস্তই করেছেন। এই মন্ত্রের এক অর্ধে তিনি আছেন, অন্য অর্ধে তিনি করছেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ-পদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ। অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন কেননা তিনি মুক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখতে হয়। তিনি যে কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্বত্র নেই। শুধু সর্বত্র নেই তা নয় সে সর্বত্র নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধর্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই সুতরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন করে—সে রকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শরীর নেই বলার দরুন কী বলা হল তা ওই অব্রণ ও অস্নাবির বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে একদিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল—স পর্যগাৎ।

তার পরে—স ব্যদধাৎ; যেমন অনন্ত দেশে তিনি পর্যগাৎ তেমনি অনন্তকালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। নিত্য কাল হতে বিধান করেছেন এবং নিত্য কালের জন্য বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নয়—

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কী? তিনি কবি। এস্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলে না। কেননা এখানে তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয় তিনি করছেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয় তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জগৎ মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগৎ-প্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন যে আপনা-আপনি যেমন-তেমন করে একটা কাণ্ড করছে তা নয় তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূঃ। কী জগৎপ্রকৃতি কী মানুষের মন সর্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু তাঁর কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্ছে না; তিনি স্বয়ম্ভু—তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এই জন্যে তাঁর কর্মকে তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান, এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রকম ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না, পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও—পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্য সাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে—ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে, বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভুত্ব সুস্পষ্ট হবে, অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভু আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বহুধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্ধ নির্বিশেষ বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করছেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ওই একটি ছোটো মন্ত্রে সে-কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

৪ মাঘ, কলিকাতা

বিশ্বব্যাপী

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ-কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইজন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ এ-কথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়—আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায় মৃত হয়ে যায়। এ-কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু এ-কথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি—যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুনলে চলে না। এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয় যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানাপ্রকার সুবিধা ঘটছে, তবে সেই দেশকে তাঁরা সুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন-সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জলস্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড়ো করে পেতুম তাকে ছোটো করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সংকীর্ণ করে দেখেন নি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মতো গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানকে সর্বত্র সার্থক করো। যিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ করো। দক্ষিণে বামে, অধোতে ঊর্ধ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ করো। তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে সেই ধীশক্তির যোগে ভূর্ভুবঃস্বলোকে সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো—নিজের তুচ্ছতাদ্বারা অগ্নি জলকে তুচ্ছ ক'রো না। সমস্তই আশ্চর্য, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ— সর্বত্রই মাথা নত হ'ক হৃদয় নম্র হ'ক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনামূল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও।

য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—পূর্বছত্রে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তার পরে আছে যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষ হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল।

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ-কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে-ঋষি বলেছেন তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন সে-ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের

দ্বারা পান নি দর্শনের দ্বারা পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে-নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে-ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গম্ভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে-কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ-কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না—কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন এই বনস্পতিতে আছেন।

৫ মাঘ

মৃত্যুর প্রকাশ

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদের অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এইজন্য ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে। জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত, এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘজীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনোদিন বিস্মৃত হন নি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হন নি, যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু—আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেন নি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়,—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরমলক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ব ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে—তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন

সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে—সেই সীমা কিছু-না-কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন—তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই। তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকে না। তাঁর পার্থিব জীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেইজন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা-অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্বাদ মূর্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এইজন্য তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অদ্যকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্পলোকেই জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না। তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

৬ মাঘ, কলিকাতা

৫

নবযুগের উৎসব

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কী, আমরা যে কী করছি, তার পরিণাম কী, তার তাৎপর্য কী সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানে না সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়ো। সে জানে না মানব-জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, এ-কথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু এ-কথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করছে না, সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠছে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের উর্ধ্বকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে-কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চলবে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সংবৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন, মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত-উৎস আছে তারই জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মতো প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়ো; এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও একে ছোটো করা হবে।

আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। এ-কথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তাহলে চিত্তের সংকোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎসবের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে না; আমরা ঠিক জেনে যাব না কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না এই সংকল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোনো—আমি জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না। মহান্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না; এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্য-ধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন—সে মূর্খই হ'ক আর পণ্ডিতই হ'ক, সে রাজচক্রবর্তী হ'ক আর দীন দরিদ্রই হ'ক—অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্তা এসে পৌঁচেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল-আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন, ঊর্ধ্বংপূর্ণংমধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন। সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বেদাহং। আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে-দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয় নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসংগীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগল নির্বাপিত প্রদীপের মতো ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আসতে থাকে তখন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোটো ছোটো জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে-ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরে সম্পদ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসংগীতের তানপুরার মতো পর্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত নিরন্তর বাজতে থাকত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক-একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে, সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলই ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতার পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলই কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্যালোক এবং বাতাসকে পর্যন্ত

তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলই বিভাগ, কেবলই বাধা। বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়। সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন, স্বাহা।

কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম জ্ঞান সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চলছে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘটলে এমন দুর্গতি কখনোই হয় না। যে বলতে পেরেছে—বেদাহং, আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমোচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখির কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসংগীতের সুর এসে পৌঁছোল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগ-যুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে-সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝংকৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বললে—বেদাহমেতং, আমি এঁকে জেনেছি। কাকে জেনেছ? আদিত্যবর্ণং—জ্যোতির্ময়কে জেনেছি যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার। সেখানে দ্বারে একজন ভয়ংকর 'না' বসে আছে, সে বলছে, না না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও। সে বলছে কান বন্ধ করো পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বসো পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলো না পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত 'না' দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি নে। কিন্তু—বেদাহমেতং। আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের; যাঁকে জানলে আর কাউকে

ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না; যাঁকে জানলে নিগ্ন দেশ যেমন জল-সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাসসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে, তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠল—দূর করো, দূর করো, একে বের করে দাও। এ তো আমার ঘরের সামগ্রী নয়। এ তো আমার নিয়মকে মানবে না।

না, এ তোমার ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেলতে পারবে না। তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে, প্রভাত এসেছে।

প্রভাত এসেছে, আমাদের উৎসব এই কথা বলছে। আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্ছে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব।

বহু যুগ পূর্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল—একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক। পৃথিবীর এই পূর্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক।

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে যে, একসূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এই মন্ত্র কোনো এক-ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো তুমি জাগ্রত হও। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পূর্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং, আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—*

* বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত্ হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহসিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীরবদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টানধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র আতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন

হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক এক এক। তিনি বলছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়। ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দিনের মধ্যে এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ-কথা নিশ্চয় জানতে হবে, সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নিচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে। এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্। বলে গিয়েছেন, মনে রাখিস, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস অদ্বিতীয় এক। সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস অদ্বিতীয় এক।

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর আমাদের নিদ্রা নেই দেখছি। "এক" আমাদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা সুস্থির থাকতে পারছি নে। আজ আমরা ঘর ছেড়ে দল ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এ-পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না—এখন দেখছি অভাব নেই। ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছোল।

তার পর থেকে আনাগোনা তো চলেইছে ; একে একে দূত আসছে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্ছে যা পূর্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মতো স্ফীত হয়ে উঠছে। আমরা অনুভব করছি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগর-সংগমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে ; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনই খুলবে এমনি আমাদের মনে হচ্ছে। কেননা কিছুকাল পূর্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আর ওই যে দেখছি বাতায়নে এক-একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্ছে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়। পৃথিবীতে কালে কালে যে-সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের ব'লে চিনেছেন ; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না ; তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয় ; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সংগীতকে এখনই বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহা-সংগীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্। সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারংবার ফিরিয়ে আনতে হবে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সামনে প্রকাশিত হতে হবে। বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের ? আমাদের পরিচয় এই যে, আমরা তারা যারা বলে না যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তারাই যারা বলে—একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা। সেই এক প্রভুই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। আমরা তারাই যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা বলি—হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ—হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে

জানা যায়। আমরা তারাই যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলি নে। আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ, এবং—বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারাই যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক এক অদ্বিতীয় এক। তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকব কেমন করে। আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখতে হবে। এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে-প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করেছে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনও সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে যে-সত্য বিরাজ করছে সে তো এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে দলিল-দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি, যাকে বলব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের। না। আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি নি; আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আসছি তা ভালো করে বুঝতে পারি নি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। এব দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, এই যে মহান আত্মা এই যে বিশ্বকর্মা দেবতা যিনি সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্তমান যুগে জগতে ধর্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য। এই আশ্চর্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করছি। এই মহৎ-সত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে, বিধাতার এই মহতী কৃপায় যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিকে প্রশস্ত করো, হৃদয়কে প্রসারিত করো, নিজেকে দরিদ্র বলে জেনো না, দুর্বল বলে মেনো না। তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ করো, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্মকে যন্ত্রবৎ ক'রো না—সত্যকে সকলের ঊর্ধ্বে স্বীকার করো এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট-বিশ্বকর্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম রচনা করেছ, হে মহান আত্মা, তা এখনও আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি। তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্‌খানে স্পর্শ করেছে, সেখানে কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চলছে তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, জগৎ সংসারে

আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝতে পারছি নে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, আমাদের দৈন্য-বুদ্ধি ঘুচছে না, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠছে না, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ করছে না। সমস্তই ছোটো হয়ে পড়েছে, স্বার্থ আরাম অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড়ো কিছুকেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নে। এ-কথা বলবার বল পাচ্ছি নে যে, সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু আমার পক্ষে তুমি আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্ছে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে। হে পরমাত্মন, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, উদ্ধার করো, আমাদের সচেতন করো। তোমার যে অভি-প্রায়কে আমরা বহন করছি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কী তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই—ভয় দূর হ'ক, অশ্রদ্ধা দূর হ'ক, অহংকার দূর হ'ক। তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত এবং এক মঙ্গল-সংকল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয়ে জেনে সর্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমারই সেই নিগূঢ় সংকল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয় কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সংকল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সংকল্পকে স্বেচ্ছাপূর্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরোই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক, হৃদয় বলতে থাক্—আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ·যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভাবুকতা ও পবিত্রতা

ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে শিল্পকলা থেকে গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্যে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিস্বরূপে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্যে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি যেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ অন্যান্য রসলাভের জন্যে যেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যদ্রব্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্যেও সেই রকম নানাপ্রকার আয়োজন করে। যাঁরা ভালো করে বলতে পারেন সেই রকম লোক সংগ্রহ করে রসোদ্রেক করবার জন্যে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়—ভগবৎ-রস নিয়মিত যোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এই রকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া ব'লে ভুল করা মানুষের দুর্বলতার একট লক্ষণ। সংসারে নানাপ্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্‌গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মানুষকে ভাই বলতে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরূপ ভাব-অনুভব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। সুতরাং ওইখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর যায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলি নে। কিন্তু একেই যদি লক্ষ্য বলে ভুল করি তাহলে এই জিনিসটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভুল মানুষ সহজেই করে, কারণ এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে দুটি পাবার পন্থা আছে।

গাছ দুরকম করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এক তার পল্লবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে—আর এক তার শিকড় থেকে সে নিজের খাদ্য আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রৌদ্র উঠছে, কখনো শীতের বাতাস দিচ্ছে, কখনো বসন্তের হাওয়া বইছে—পল্লবগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে তারই থেকে আপনার যা নেবার তা নিচ্ছে। তার পরে আবার শুকিয়ে ঝরে পড়ছে—আবার নতুন পাতা উঠছে।

কিন্তু শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিরন্ত স্তব্ধ হয়ে দৃঢ় হয়ে গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে নিয়ত আপনার খাদ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করছে।

আমাদেরও শিকড় এবং পল্লব এই দুটো দিক আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য এই দুই দিক থেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্ছে চরিত্রের দিক, এটা ভাবের দিক নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। সেখানে চাঞ্চল্য নেই, সেখানে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নেই— সেইখানেই আমরা শান্ত হই, স্তব্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই জায়গাটির কাজ বড়ো অলক্ষ্য বড়ো গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করে কিন্তু ভাব-ব্যক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে না। সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চরিত্র যে-শক্তির দ্বারা প্রাণ বিস্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা। সে অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে যেখানে ধরে আছে সেখানে ধরেই আছে, কেবলই গভীর থেকে গভীরতরে গিয়ে নাবছে। সে শুদ্ধচারিণী স্নাত পবিত্র সেবিকার মতো সকলের নিচে জোড়হাতে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে— দাঁড়িয়েই আছে।

হৃদয়ের কত পরিবর্তন। আজ তার যে-কথায় তৃপ্তি কাল তার তাতে বিতৃষ্ণা। তার মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলছে, কখনো তার উল্লাস কখনো অবসাদ। গাছের পল্লবের মতো তার বিকাশ আজ নূতন হয়ে উঠছে কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পল্লবিত চঞ্চল হৃদয় নব নব ভাব-সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুলতায় স্পন্দিত।

কিন্তু মূলের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন যোগ না থাকে তাহলে এই সকল ভাব-সংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও বিনাশেরই কারণ হয়। যে-গাছের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে সূর্যের আলো তাকে শুকিয়ে ফেলে, বৃষ্টির জল তাকে পচিয়ে দেয়।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগানো বন্ধ করে দেয় তাহলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না কেবল বিকৃতি জন্মাতে থাকে। দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই; সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনিই এসে পড়ছে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের

থেকে বর্জিত হয় না—সেটা নিজের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পবিত্রতাই আমাদের মূলের জিনিস, আর ভাবুকতা পল্লবের।

প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা সুগভীর নিস্তব্ধভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, তোমার পায়ের ধুলো নিলুম আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল। প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধূলি মাথায় তুলে সমস্ত দিনের কর্মে নির্মল সতেজভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করব।

২ ফাল্গুন, ১৩১৫

অন্তর বাহির

আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকারে মেলবার জন্যে, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মানুষের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই সমস্ত প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্যালাপ, কত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, কত লীলাখেলায় সে যে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার সীমা নেই।

মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রেমবশতই যে আমাদের এই চাঞ্চল্য এবং উদ্যম প্রকাশ পায় তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক একই লোক নয়—অনেক সময় তার বিপরীতই দেখতে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাখে;—নানা প্রকার সামাজিক আলাপ, সামাজিক কাজ, সামাজিক আমোদ সৃষ্টি করে আমাদের মনের উদ্যমকে আকর্ষণ করে নেয়। এই উদ্যমকে কোন্ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শান্ত করব সে-কথা আর চিন্তা করতেই হয় না—লোক-লৌকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত হয়ে যায়।

যে-ব্যক্তি অমিতব্যয়ী সে যে লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যে দান করে নিজেকে নিঃস্ব করে তা নয়—ব্যয় করবার প্রবৃত্তিকে সে সংবরণ করতে পারে না। নানা রকমের খরচ করে তার উদ্যম ছাড়া পেয়ে খেলা করে খুশি হয়।

সমাজে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে খরচ করে, সে যে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নয় কিন্তু নিজেকে খরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তিবশত।

চর্চা দ্বারা এই প্রবৃত্তি কীরকম অপরিমিতরূপে বেড়ে উঠতে পারে তা য়ুরোপে যারা সমাজ-বিলাসী তাদের জীবন দেখলে বোঝা যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই—উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন। কোথায় শিকার, কোথায় নাচ, কোথায় খেলা, কোথায় ভোজ, কোথায় ঘোড়দৌড় এই নিয়ে তারা উন্মত্ত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কোনো পথ বেয়ে চলছে না, কেবল দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এই উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘুরছে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদূর যাই নে কিন্তু আমরাও সমস্ত দিন অপেক্ষাকৃত মৃদুতর ভাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে খরচ করবার জন্যেই খরচ করে থাকি। মনকে মুক্তি দেবার, শক্তিকে খাটিয়ে নেবার আর কোনো উপায় আমরা জানি নে।

দানে এবং ব্যয়ে অনেক তফাত। আমরা মানুষের জন্যে যা দান করি তা এক দিকে খরচ হয়ে অন্যদিকে মঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই খরচ। তাতে দেখতে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলই নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না। তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে—নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্‌কারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে কেবলই তাকে নূতন নূতন কৃত্রিমতা রচনা করে চলতে হয়—কোথাও থামতে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এইজন্যে যাঁরা সাধক, পরমার্থ লাভের জন্যে নিজের শক্তিকে যাঁদের খাটানো আবশ্যক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্বতে নির্জনে লোকালয় থেকে দূরে চলে যান। শক্তির নিরন্তর অজস্র অপব্যয়কে তাঁরা বাঁচাতে চান।

কিন্তু বাইরে এই নির্জনতা এই পর্বতগুহা কোথায় খুঁজে বেড়াব? সে তো সব সময় জোটে না। এবং মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়াও তো মানুষের ধর্ম নয়।

এই নির্জনতা এই পর্বতগুহা এই সমুদ্রতীর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে—আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি না থাকত তাহলে নির্জনতায় পর্বতগুহায় সমুদ্রতীরে তাকে পেতুম না।

সেই অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই, সেই জন্যেই আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহরহ এই যে নিঃশেষ করে ফতুর হয়ে যাচ্ছি—বাইরের সংস্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়, কারণ মানুষকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে বলা, রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর যথার্থ প্রতিকার হচ্ছে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাহলেই জীবন সহজেই নিজেকে উন্মত্ত অপব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্মলুব্ধ লোককে দেখতে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উদ্যমকে কেবলই মানদণ্ড হাতে করে হিসাবি কৃপণের মতো খর্ব করছে। তারা নিজের বরাদ্দ যতদূর কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে কেবলই শুষ্ক কৃশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করছে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না। আর যাই হ'ক মানুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে উদ্দামভাবে বেহিসাবি হলেও চলবে না, কৃপণভাবে হিসাবি হলেও চলবে না।

এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্ছে, বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের একমাত্র নয় অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারংবার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। সেই নিভৃত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে, যখন-তখন ঘোরতর কাজকর্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেইখানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ তো কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে সর্বত্রই সেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করছেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করছেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস করো, শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বদাই জানো। যখন হাসছ খেলছ কাজ করছ তখনও একবার সেখানে যেতে

যেন কোনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাত হয়ে উল্‌টে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ো না। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না—বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়ো না।
সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

৩ ফাল্গুন

তীর্থ

আজ আবার বলছি—ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে! এই কথা যে প্রতিদিন বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে আমাদের চির আশ্রয় আছেন এ-কথা বলার প্রয়োজন কবে শেষ হবে?

কথা পুরাতন হয়ে ম্লান হয়ে আসে, তার ভিতরকার অর্থ ক্রমে আমাদের কাছে জীর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা অনাবশ্যক বলে পরিহার করি। কিন্তু প্রয়োজন দূর হয় কই?

সংসারে এই বাহিরটাই আমাদের সুপরিচিত, এইজন্যে বাহিরকেই আমাদের মন একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। আমাদের অন্তরে যে অনন্ত জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে সেটা যেন আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। যদি তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট হত তাহলে বাহিরের একাধিপত্য আমাদের পক্ষে এমন উদগ্র হয়ে উঠত না; তাহলে বাহিরে একটা ক্ষতি হবামাত্র সেটাকে এমন একান্ত ক্ষতি বলে মনে করতে পারতুম না, এবং বাহিরের নিয়মকেই চরম নিয়ম মনে করে তার অনুগত হয়ে চলাকেই আমাদের একমাত্র গতি বলে স্থির করতুম না।

আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টিপাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে সেই অনুসারেই আমাদের ভালোমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি—এইজন্য লোকের কথা আমাদের মর্মে বাজে, লোকের কাজ আমাদের এমন করে বিচলিত করে, লোকভয় এমন চরম ভয়, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা। এইজন্যে লোকে যখন আমাদের ত্যাগ করে তখন মনে হয় জগতে আমার আর কেউ নেই। তখন আমরা এ-কথা বলবার ভরসা পাই নে যে—

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।

সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয়; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও এক মুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না; অন্তর্যামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করে নি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না।

অরাজক রাজত্বের প্রজার মতো আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি, আমাদের নানা শক্তিকে নানাদিকে কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে। সুখসমৃদ্ধির জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি। একবার খবরও রাখি নে যে, অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই তো সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বসে আছি, এবং আমিও অন্য লোককে বাইরে থেকে বিচার করছি। কাউকে সত্যভাবে ক্ষমা এবং নিত্যভাবে প্রীতি করতে পারছি নে, মঙ্গল-ইচ্ছা কেবলই সংকীর্ণ ও প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মঙ্গলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহজভাবে না পাই, ততদিন প্রত্যহই বলতে হবে—ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে। নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সেই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্যের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখতে পাব না এবং অন্যের সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না। যখন জানব যে পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন—তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে, তখন সংযম কেবল বাহিরের নিয়মপালনমাত্র হবে না। যে-পর্যন্ত তা না হয়, যে-পর্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একান্ত, যে-পর্যন্ত বাহিরই সমস্তকে অত্যন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে সমস্ত অবকাশ রোধ করে ফেলে—সে-পর্যন্ত কেবলই বলতে হবে—

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়ো না।
সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

কেননা, সংসারকে একমাত্র জানলেই সংসার সংকটময় হয়ে ওঠে—তখনই সে অসহায় অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

প্রতিদিন এস, অন্তরে এস। সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হ'ক, কোনো আঘাত না পৌঁছোক, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক। সেখানে ক্রোধকে পালন ক'রো না, লোভকে প্রশ্রয় দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জ্বালিয়ে রেখো না, কেননা সেই-খানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেবমন্দির। সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবে না, সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্যস্থানের ফটক বন্ধ। এস সেই অক্ষুব্ধ নির্মল অন্তরের মধ্যে এস, সেই অনন্তের সিন্ধুতীরে এস, সেই অত্যুচ্চের গিরিশিখরে এস। সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও, সেখানে নত হয়ে নমস্কার করো। সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই গিরিশৃঙ্গের নিত্যবহমান নির্ঝরধারা থেকে পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও; সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।

৪ ফাল্গুন

বিভাগ

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন সুবিহিত সুশৃঙ্খল সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভালোরকম না হলে ঐক্যটিও ভালোরকম হয় না। অপরিণতি যখন পিণ্ডাকারে থাকে, যখন তার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে, তখন তার মধ্যে একের মূর্তি পরিস্ফুট হয় না।

আমাদের মধ্যে খুব একটি বড়ো বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্ছে অন্তর এবং বাহিরের বিভাগ। যতদিন সেই বিভাগটি বেশ সুনির্দিষ্ট না হবে ততদিন অন্তর ও বাহিরের ঐক্যটিও পরিপূর্ণ তাৎপর্যে সুন্দর হয়ে উঠবে না।

এখন আমাদের এমনি হয়েছে আমাদের একটি মাত্র মহল। স্বার্থপরমার্থ নিত্য-অনিত্য সমস্তই আমাদের ওই এক জায়গায় যেমন-তেমন করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। সেইজন্তে একটা অন্যটাকে আঘাত করে, বাধা দেয়, একের ক্ষতি অন্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

যে-জিনিসটা বাহিরের তাকে বাহিরেই রাখতে হবে তাকে অন্তরে নিয়ে গিয়ে তুললে

সেখানে সেটা জঞ্জাল হয়ে ওঠে। যেখানে যার স্থান নয় সেখানে সে যে অনাবশ্যক তা নয় সেখানে সে অনিষ্টকর।

অতএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই বাহিরের জিনিস যাতে বাহিরেই থাকতে পারে ভিতরে গিয়ে যাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে ক্ষতি হয়, আজ যা আছে কাল তা থাকে না। সেই ক্ষতিকে আমরা বাহিরের সংসারেই কেন রাখি না, তাকে আমরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তুলি কেন?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্‌গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু সে তো বাইরেই ঝরে পড়ে যায়। সেই তার বাহিরের অনিবার্য ক্ষতিকে গাছ তার মজ্জার ভিতরে তো পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে, অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহতভাবে চলে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে রক্ষা করি নে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাখরচ ভিতরের খাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামি বইটাকে নষ্ট করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপকল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখতে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহলে একটা স্থায়িত্বের ধর্ম আছে—সেখানে জমা করবার জায়গা। এইজন্যে সেখানে এমন কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিস নয়। তা নিতে গেলেই বিকারকে স্থায়ী করে তোলা হয়। মৃতদেহকে কেউ অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে, জলে বা আগুনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে এই দুটি কক্ষ আছে, স্থায়িত্বের এবং অস্থায়িত্বের—অন্তরের এবং সংসারের।

অন্য জন্তুদের মধ্যেও সেটা অস্ফুটভাবে আছে—তেমন গভীরভাবে নেই। সেইজন্যে অন্য জন্তুরা একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। তারা, যেটা স্থায়ী নয় সেটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টাও করে না, কারণ, স্থায়ী করবার উপায় তাদের হাতে নেই।

মানুষও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে কিন্তু অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপরে স্থায়িত্বের মালমসলা প্রয়োগ ক'রে তাকে যতদিন পারে টিঁকিয়ে রাখতে ত্রুটি করে না। তার অন্তরপ্রকৃতি নাকি স্থায়িত্বের নিকেতন এই জন্যেই তার সুবিধাটা ঘটেছে।

তার ফল হয়েছে এই যে, জন্তুদের মধ্যে যে-সকল প্রবৃত্তি প্রয়োজনের অনুগত হয়ে

আপন স্বাভাবিক কর্ম সমাধা করে একেবারে নিরস্ত হয়ে যায় মানুষ তাকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিয়ে কল্পনার রসে ডুবিয়ে তাকে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরতে দেয় না। এইজন্যে বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে অন্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে। বাইরে যে-জিনিসটা অন্ন-সংগ্রহ-চেষ্টারূপে প্রাণ রক্ষা করবার উপায়, তাকেই যদি ভিতরে টেনে নিয়ে সঞ্চিত কর তবে সেইটেই তৃপ্তিহীন ঔদরিকতার নিত্যমূর্তি ধারণ করে স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতেই থাকে।

তাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে এই নিত্যের নিকেতন, পুণ্যের নিকেতন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্যনিকেতনে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবশ্যক খাদ্য জোগানোর জন্যে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্ছে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগ্য, তা দৈত্যের খাদ্য নয়। যে-দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাহু এবং লেজটা কেতু আকারে বৃথা বেঁচে থেকে নিদারুণ অমঙ্গলরূপে সমস্ত জগৎকে দুঃখ দিচ্ছে।

আমাদের যে-অন্তরভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইখানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার দিই তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমঙ্গলটার খোরাক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সম্বল সংগতি নিঃশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাণ্ডার আছে বলেই আমাদের এই দুর্গতি।

এই অমৃতের নিত্যনিকেতনে দৈত্যের কোনো অধিকার নেই বটে কিন্তু বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট। সে দুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে পর্বত বিদীর্ণ করে পথ করে দিতে পারে। তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভুর কাজ উদ্ধার করে দিয়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত তো দাসের বেতন নয়, সে যে দেবতার পূজার ভোগ-সামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

তাই বলছিলুম, যেটা বাইরের সেটাকে বাইরে রাখবার সাধনাই জীবনযাত্রার সাধনা।

৫ ফাল্গুন ১৩১৫

দ্রষ্টা

অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখো না। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসার-সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।

থেকে থেকে ঘোরতর কর্মসংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তরকে নির্লিপ্ত বলে অনুভব ক'রো। এই রকম ক্ষণে ক্ষণে বারংবার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতরে থেকে একবার চকিতের মতো দেখে নিতে হবে, সেই অন্তরের মধ্যে কোনো কোলাহল পৌঁছোচ্ছে না। সেখানে শান্ত স্তব্ধ নির্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না। এই যে আনাগোনা, লোকলৌকিকতা, হাসি-খেলার মহা জনতা, এর মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে একবার অন্তরের অন্তরে ঘুরে এস—দেখে এস সেখানে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বলছে, অমুত্তরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌঁছোয় না, ক্রোধের গর্জন সেখানে শান্ত।

এই বিশ্বসংসারে এমন কিছু নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা—কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নন। এই জগৎ তাঁরই বটে, তিনি এর সর্বত্রই আছেন বটে কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেই রকম করেই জানবে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর। এই সংসারে, শরীরে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার, শরীর, বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই যে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে বিশেষ নাম ধরে নানা সুখ দুঃখ ভোগ করছে এই তাঁর বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে যাই, নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে বিবিক্ত করে আত্মাকে যখন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তখন দেখতে পাই তা শূন্য নয়, তখন নিজের অন্তরে সেই নির্মল নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াং। নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় পরম কোষকে জানতে পারি যেখানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজমান।

এইজন্যই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অন্তরাত্মাকে জানো তাহলেই অমৃতকে জানবে, তাহলেই পরব্রহ্মকে জানবে। তাহলে সমস্তের মাঝখানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছু পরিত্যাগ না করে মুক্তি পাবে—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৬ ফাল্গুন

নিত্যধাম

উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানব কোন্‌খানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর-নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখো—যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখো—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে একমুহূর্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও। তাহলেই ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে, এবং তাহলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধিব্যাধি জরা-মৃত্যু বিচ্ছেদ-মিলন, যেখানে আনাগোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলই যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ—যদি তাকে কেবলই কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান, তাহলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখবে, তাহলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলই শোক করতে থাকবে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয় তাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে-সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন আত্মারই ক্ষয় হচ্ছে বিনাশ হচ্ছে—এমনি করে বারংবার শোকে নৈরাশ্যে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড় পদ দেওয়াতে সংসার তোমার দত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে

দেখো তাহলেই হর্ষশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে। তাহলে ক্ষতিতে, নিন্দাতে, পীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভয়? জয়ী, আত্মা জয়ী। আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসানুদাস নয়—আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত। আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত। সেইজন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা—ন বিভেতি কদাচন।

পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

পরমব্রহ্মের মধ্যে যাঁরা আপনাকে যুক্ত করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন।

আর সংসারে যাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা শোচতি শোচতি শোচত্যেব।

৭ ফাল্গুন ১৩১৫

পরিণয়

চারিদিকে সংসারে আমরা দেখছি—সৃষ্টিব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে,—এক মুহূর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিবর্তির পথে চলেছে কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিসমাপ্তি নেই। আমাদের শরীর-বুদ্ধি-মনও প্রকৃতির এই চক্রে ঘুরছে, ক্রমাগতই তার সংযোগ বিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই সূর্যতারাময় লক্ষকোটি চাকার রথ ধাবিত হচ্ছে—কোথাও এর শেষ গম্যস্থান দেখি নে, কোথাও এর স্থির হবার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি, যেন এক জায়গায় যাবার আছে এইরকম মনে হচ্ছে অথচ কোনোকালে কোথাও পৌঁছোতে পারছি নে? আমাদের অস্তিত্বই কি এই রকম অবিশ্রাম চলা, এই রকম অনন্ত সন্ধান? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই?

এই যদি সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তাহলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিব্যজ্যমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে তবে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা-কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে তার কোনো

তা যদি হয় তবে এই ব্রহ্মের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। যাঁকে কোনো কালেই পাব না তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে? তাহলে এই কথাই বলতে হয় সংসারকেই পাওয়া যায়, সংসারই আমার আপনার, ব্রহ্ম আমার কেউ নন।

কিন্তু সংসারকেও তো পাওয়া যায় না। সংসার তো মায়ামৃগের মতো আমাদের কেবলই এগিয়ে নিয়ে দৌড় করায়, শেষ ধরা তো দেয় না। কেবলই খাটিয়ে মারে ছুটি দেয় না—ছুটি যদি দেয় তো একেবারে বরখাস্ত করে। এমন কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করে না যা চরম সম্বন্ধ। ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্বন্ধ তার সঙ্গে আমাদেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ সে কেবলই আমাদের চালাবে, খাওয়াবে সেও চালাবার জন্যে, মাঝে মাঝে যেটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জন্যে, চাবুক লাগাম সমস্তই চালাবার উপকরণ। যখন না চলব তখন খাওয়াবেও না, আস্তাবলেও রাখবে না, ভাগাড়ে ফেলে দেবে। অথচ এই চালাবার ফল ঘোড়া পায় না। ঘোড়া স্পষ্ট করে জানেও না সে ফল কে পাচ্ছে। ঘোড়া কেবল জানে যে তাকে চলতেই হবে; সে মূঢ়ের মতো কেবলই নিজেকে প্রশ্ন করছে, কোনো কিছুই পাচ্ছি নে, কোথাও গিয়ে পৌঁছোচ্ছি নে তবু দিনরাত কেবলই চলছি কেন? পেটের মধ্যে অগ্নিময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, হৃদয় মনের মধ্যে কত শত জ্বালাময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এর অর্থ কী?

যাই হ'ক কথা হচ্ছে এই যে, সংসারকে তো কোনোখানেই পাচ্ছি নে, তার কোনোখানে এসেই থামছি নে—ব্রহ্মও কি সেই সংসারেরই মতো? তাঁকেও কি কোনোখানেই পাওয়া যাবে না? তিনিও কি আমাদের অনন্তকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়াহীন চলাকেই অনন্ত উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলই কোনোমতে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করব?

তা নয়। ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই—সংসারের তত্ত্বই হচ্ছে সরে যাওয়া, সুতরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাওয়া হবে। কিন্তু ব্রহ্মকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে একথা বলা কোনোমতেই চলবে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। কেননা তিনিই হচ্ছেন সত্য।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করছি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্ছি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলছি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের

নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করছি এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশ-কালের রাজত্ব নয়, সেখানে ক্রমশ সৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষৎ বলছেন—

সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্বানি কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যোম যে পরম ব্যোম যে চিদাকাশ অন্তরাকাশ সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন তাঁর সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন একথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে সুগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমতো জানলে বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘুরিয়ে মারে না পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন। এইজন্য সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাই নে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—যদেতং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি "অস্য" "এষ" হয়ে আছেন। তিনি এর এই হয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি—সংসারে তাঁরই প্রেমের

লীলা। এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ—আনন্দের অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া-না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান-পরম্পরার ভিতর দিয়ে নানা রকমে পাচ্ছি;—যাঁকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্ছি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখে নি—বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে সে যেখানে তার রানীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে। ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

সৌভিক্যাৎ যাতি সৌভিক্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ম্।

৯ ফাল্গুন ১৩১৫

৬

তিনতলা

আমাদের তিনটে অবস্থা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে; একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তখন প্রকৃতিই আমাদের সমস্ত উপলব্ধির ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সমুদয় প্রবৃত্তি, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রয়াস। এমন কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকতে পারি না— আমাদের মনের জিনিসগুলিও আমাদের কল্পনায় বাহ্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বদ্ধ করে অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরূপ দান করে আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই শামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়াদ্বারা শান্ত করবার চেষ্টা করি। তাঁর সম্মুখে বলি দিই, খাদ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অনুশাসনগুলিও বাহ্য অনুশাসন। কোন্ নদীতে স্নান করলে পুণ্য, কোন্ খাদ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাথা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কী-রকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে উচ্চারণ করা আবশ্যক, এই সমস্তই তখন ধর্মানুষ্ঠান।

এমনি করে দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শাদি দ্বারা মনের দ্বারা কল্পনার ভয়ের দ্বারা ভক্তির দ্বারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানারকমে আঘাত করে এবং তার দ্বারা আঘাত খেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্বের মতো একমাত্র বলে মনে হয় না। তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ বলে আর জানি নে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই যখন আমরা তার সীমা দেখতে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মাল। তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগলুম, সংসারকে একেবারে সর্বতোভাবে অস্বীকার করবার জন্যে মনে বিদ্রোহ জন্মাল। তখন বলতে লাগলুম, যার মধ্যে কেবলই আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মতো অনন্ত প্রদক্ষিণ

তাকেই আমরা সত্য বলে তারই কাছে আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম, আমাদের এই মূঢ়তাকে ধিক্।

তখন বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম। যে-প্রবৃত্তিগুলি এতদিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘুরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে একেবারে নির্মূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল সেই সকল কষ্ট ও অভাবকে আমরা একেবারে তুচ্ছ করে দিলুম। রাজসূয় যজ্ঞ করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজাকে হার মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তর-রাজধানীর উচ্চ প্রাসাদ-চূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। সুখ-দুঃখকে কড়া পাহারায় রাখলুম, পূর্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্যস্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা-লাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে এ কী দেখি? এ তো জয়গর্ব নয়। এ তো কেবল আত্মশাসনের অতি-বিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো কেবল অন্তরের নিয়ম-বন্ধন নয়। শান্তদান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দ-জ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাসিত করেছে, অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গলরশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তখন ভিতর বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তখন জয় নয় তখন আনন্দ, তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা, তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব;—তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম—তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

১০ ফাল্গুন ১৩১৫

বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল

আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টাকে উদ্বোধিত করে তোলবার ভার সবপ্রথমে বাহিরের উপরেই ন্যস্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে।

সে আমাদের জাগাবে, অভিভূত করবে না এই ছিল কথা। জাগব এইজন্যে যে নিজের চৈতন্যময় কর্তৃত্বকে অনুভব করব—দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাস্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাস্টার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার মূঢ়তা জড়তা দূর করে তাকে রাজত্বের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে, এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া। রাজা যে কারও দাস নয় এই শিক্ষাই হচ্ছে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মাস্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানা প্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মাস্টারের প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মুগ্ধ সংস্কারে এমনি জড়িত করে যে, বড়ো হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মাস্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে থাকে।

তেমনি বাহিরও যখন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছোয়, যখন সে আমাদের উপর চেপে পড়বার জো করে তখন তাকে একেবারে বরখাস্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্ছে শ্রেয়ের পন্থা।

বাহির যে-শক্তি দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে আমরা বলি বাসনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে। যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে—এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্ছে সহজ উপায়।

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে—এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমরা নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না। বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোনোপ্রকার ঐশ্বর্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুদ্রতা থেকে আর-এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিসকে মানুষ গড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্ জায়গায় গিয়ে থামে? ইচ্ছায়। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের

বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিসটা অন্তরের জিনিস। ইচ্ছা আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না—সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চারিদিকে বেঁধে ফেলে।

তখন কী হয়? না, যে-সকল বাসনা নানা প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাখি তাহলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তেমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সংবরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে হয়, কোনো বাহ্য বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্য থেকে ভুলিয়ে না নিতে পারে সে-জন্যে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয় সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে চায়, তাহলেই বাহিরের কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে ভিতরের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষের সৃষ্টিকার্য চলে না। বাসনা যখন তার ভিতরের কূল পরিত্যাগ করে তখন সে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

যেখানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে বিদ্যায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাসনার বিষয় যেমন বহির্জগতে বিচিত্র তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও তো অন্তর্জগতে একটি আধটি নয়। কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিদ্যার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠতে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে তো কম নয়।

তা ছাড়া আর একটা জিনিস দেখতে পাই। যখন বাসনার অনুগামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাজাকে প্রভু করেছিলুম তখন যে-বেতন মিলত তাতে তো পেট ভরত না। সেইজন্যেই মানুষ বারংবার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড়ো দুঃখের চাকরি। এতে যে খাদ্য পাই তাতে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অনুগত হয়ে ভিতরের এক-একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যখন ঘুরে বেড়াই তখনও তো অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। শান্তি আসে, অবসাদ আসে, দ্বিধা আসে। কেবলই উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়—শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘুরিয়ে মারে, এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এইজন্য, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মানুষের ভিতরকার কামনা—সে-রকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সফলতা দেখতে পায় না তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো এক প্রভুর অনুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জন্যে ভিতরের যে সৈন্যদল সে জড় করলে নায়কের অভাবে সেই দুর্দান্ত সৈন্যগুলার হাতেই সে মারা পড়বার জো হয়। সৈন্যনায়ক রাজ্য দস্যুবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভালো বটে, কিন্তু সেও সুখের রাজ্য নয়। তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্য, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্য। এখানে সৈন্যের রাজত্ব।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কখন উপভোগ করি? যখন বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা, মঙ্গল ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়, সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভু। সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যখন আমার ইচ্ছার সৈন্যদলকে দাঁড় করাই তখনই তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তখন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল, অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম তখন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অন্তরের দুর্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম, রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর ক'রে গ্রহণ করলে।

১১ ফাল্গুন

স্বাভাবিকী ক্রিয়া

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করছে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে সংগত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না—অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না,

লোকের খ্যাতিই তাকে কোনোরকমে জীবিত করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত। তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেইজন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর মঙ্গলইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও চলছে। আজও বুদ্ধগয়ার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসারতাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্বকল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলছে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্ছে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করছে—তাঁর সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্ এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল। যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুসে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকে বুকে গেল—এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়। ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীনভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরম মঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীরু, হে দুর্বল, সেই শক্তিকে আশ্রয় করো, সেই ক্রিয়াকে

লাভ করো—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে বৃথা আক্ষেপে কাল হরণ ক'রো না—তোমার সামান্য যা সম্বল আছে তা রাজার ঐশ্বর্যকে লজ্জা দেবে।

১১ ফাল্গুন

পরশরতন

তাঁর নাম পরশরতন
পাপি-হৃদয়-তাপহরণ—
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে।

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সেই পরশরতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে স্পর্শ করাতে হবে, আমার মনের চিন্তাকে স্পর্শ করাতে হবে—আমার সংসারের কর্মকে স্পর্শ করাতে হবে।

তাহলে, যা হালকা ছিল একমুহূর্তে তাতে গৌরব সঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকালবেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব—তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব, উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করব না—তাকে চরিত্রের সম্বল করব, তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতালাভ করব না—প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়, তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হয়ে সকালবেলাকার হাওয়াতেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রখর তখনই স্নিগ্ধতার দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তখনই বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুষ্কতা আসে, দাহ জন্মায়। ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে তখনই আপনাকে হারিয়ে ফেলি।

আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সময়েই যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারি, সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মতো মন্দিরেরই পুজার্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো না থাকে—তাহলে কোনো কাজ হল না।

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস অত্যন্ত অনুদার। যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন—যে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে, সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশকালে তুচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই—আত্মার মহিমাকে তখনও যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি। যেন তখনই মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে, মনে পড়ে যে অনন্ত চৈতন্য-স্বরূপ এই মুহূর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন, মনে পড়ে যে সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তাই বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আহ্লাদকে একেবারে বিসর্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম করে পেয়ে বসে—ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরও বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে। স্বভাবত যে জিনিসটা বাইরের ক্ষণিক জিনিস, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অন্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব। ছোটোকে বড়ো করে তুলব না, শ্রেয়কে প্রেমের আসনে বসতে দেব না এবং সকল সময়ে সকল কর্মেই অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চলতে দেব। তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে বুঝতে দেব না—কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও—সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিখেলা আমাদের কাজকর্ম আমাদের বিষয়-আশয় যা কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও। আপনিই সমস্ত বড়ো হয়ে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে।

১২ ফাল্গুন

অভ্যাস

যিনি পরম চৈতন্যস্বরূপ তাঁকে আমরা নির্মল চৈতন্যের দ্বারাই অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করব এই রয়েছে কথা। তিনি আর কোনোরকমে সস্তায় আমাদের কাছে ধরা দেবেন না—এতে যতই বিলম্ব হ'ক। সেইজন্যেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই—আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন মনন সমস্তই চলছে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরিসমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হ'ক বিলম্বে হ'ক, সেজন্যে তিনি কোনো অস্ত্রধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাচ্ছেন না। সেটি একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রৌদ্রবৃষ্টির পরম্পরায়, অনেক দিন ও রাত্রির শুশ্রূষায় তার হাজারটি দল একটি বৃন্তে ফুটে উঠবে।

সেইজন্যে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রাতঃকালে উপাসনার জন্যে অনেকে সমবেত হয়েছি, এখানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিত্তটিকে তো আনতে পারি নে—তবে এ-কাজটি কি আমাদের ভালো হচ্ছে? নির্মল চৈতন্যের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করায় আমরা কি অন্যায় করছি নে?

আমার মনে এক-এক সময় অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়। মনে ভাবি যিনি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র জবরদস্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা লেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি, পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি, কিছুমাত্র আলস্যের বাধা ঘটে, পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাজের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিমুখতার সৃষ্টি করে। উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্য যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা যদি কিছু মনে করেন, যদি কেউ নিন্দা করেন বা বিরক্ত হন, পাছে এই তাগিদটাই সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সেই জন্যে এক-এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অনুকূল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এসো না।

কিন্তু সংসারটা যে কী জিনিস তা যে জানি। এ-সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। জানি দুঃখ কাকে বলে, আঘাত কী প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে-সময়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন সকলের বেশি সেই সময়ে আশ্রয় কিরূপ দুর্লভ। তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন, চারদিকেই তাকে টানাটানি করে মারে। দেখতে দেখতে তার সুর নেবে যায়, তার কথা, চিন্তা, কাজ,

তুচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত্ত—সে এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই। ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্মে এসে আঘাত করে, দুঃখ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে সুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না। সুখ একেবারে মত্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হয়ে এসে তাকে বাজে। এ-কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন সমস্ত সংকোচ মন হতে দূর হয়ে যায়—তখন ভীত হয়ে বলি, না, শৈথিল্য করলে চলবে না। একদিনও ভুলব না, প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে, প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রয় দিয়ে তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে তুমি সংসারের চেয়ে বড়ো তুমি সকলের চেয়ে বড়ো।

যেমন করে পারি তেমনি করেই বলব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র অন্তর্যামী তা জানেন। কোনোদিন আমাদের মনে কিছু জাগে কোনোদিন একেবারেই জাগে না—মনে বিক্ষেপ আসে, মনে ছায়া পড়ে। উপাসনার যে-মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না। দিনের পর দিন এই দ্বারে এসে দাঁড়াব, দ্বার খুলুক আর নাই খুলুক। যদি এখানে আসতে কষ্ট বোধ হয় তবে সেই কষ্টকে অতিক্রম করেই আসব। যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখতে চায় তবে ক্ষণকালের জন্যে সেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেখেই আসব।

কিছু না-ই জোটে যদি তবে এই অভ্যাসটুকুকেই প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও যে বাধাটা অতিক্রম করতে হয় যে জড়তা মোচন করতে হয় সেটাতেও যেন কুণ্ঠিত না হই। অত্যন্ত দরিদ্রের যে রিক্তপ্রায় দান সেও যেন প্রত্যহই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা, দিনের সকল কর্মে সকল চিন্তায় যাঁকে রাজা করে বসিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া, কিন্তু তাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একান্তই "না" করে রেখে দেব, এ তো কোনোমতেই হতে পারে না।

দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে, পিতা নোঽসি—তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা। আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্যে তোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। কেবল সেইটুকু সময় থাক্ তোমাদের কাজকর্ম, থাক্ তোমাদের আমোদ-প্রমোদ। আর সমস্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও—পিতা নোঽসি।

তাঁর জগৎসংসারের কোলে জন্মে, তাঁর চন্দ্রসূর্যের আলোর মধ্যে চোখ মেলে জাগরণের প্রথম মুহূর্তে এই কথাটি তোমাদের জোড়হাতে প্রত্যহ বলে যেতে হবে: ওঁ পিতা নোঽসি। এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখছি। এত বড়ো বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না—এ তো কিছুতেই হতে পারবে না। তোমার অপরিস্ফুট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শূন্য হৃদয়কেও দান করো, তোমার শুষ্কতা রিক্ততাকেই তাঁর সম্মুখে ধরো, তোমার সুগভীর দৈন্যকেই তাঁর কাছে নিবেদন করো। তাহলেই যে দয়া অযাচিতভাবে প্রতিমুহূর্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে। এবং প্রত্যহ ওই যে অল্প একটু বাতায়ন খুলবে সেইটুকু দিয়েই অন্তর্যামীর প্রেমমুখের প্রসন্ন হাস্য প্রত্যহই তোমার অন্তরকে জ্যোতিতে অভিষিক্ত করতে থাকবে।

১৩ ফাল্গুন

প্রার্থনা

হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি যে আছ, দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি বলে আসছে—সত্যং। তুমি আছ, তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠছে, তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভরে সকলের উপরে জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে—যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্ময়, আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্যলোকে যে জ্যোতি কুলোয় না, সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় স্নান করে ফেলো, আমাকে জ্যোতির্ময় করো, আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।

হে অমৃতস্বরূপ, আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দং। সেখানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না তুমি মিলেছ, সেখানে তোমার কেবল সত্য নয় সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না, অনন্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি। সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাও নি; সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই; কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু। আমি যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বান আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হক, অতি দূরে চলে যাক, অতি গোপনে প্রবেশ করুক। সকল দিক থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই। ডাক দাও— ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা-কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে খুব গোপনে।

হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো— আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিময়। কেবলই তুমিময় জ্যোতি, কেবলই তুমিময় আনন্দ।

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো। কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক। এ যে বহুদিনের বহু দুশ্চেষ্টার ফল, শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে। শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই। যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকবে। তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তার পরে হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক্। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসংকট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন

অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক্। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব তখনই রক্ষা পাব।

১৪ ফাল্গুন

বৈরাগ্য

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

অর্থাৎ

পুত্রকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয় কিন্তু আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয়, এবং সেইজন্যেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যখন স্বার্থ এবং অহংকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থাকে তখন সে বড়োই ম্লান হয়ে থাকে, তখন তার সত্য স্ফূর্তি পায় না। এইজন্যেই আত্মা পুত্রের মধ্যে মিত্রের মধ্যে নানা লোকের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়ে থাকে কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাইনি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিনুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন "কর" "খল" প্রভৃতি পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাৎপর্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয় না বিরক্তিবোধ হয়, এখন ব্যাপক অর্থযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের

সার্থকতার একটা রূপ দেখতে পায়—সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোটো আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা আমিতেই সার্থক। এইজন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজছে। আমার আমি যখন পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কী ঘটে? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তখন মুশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষে যে সেই বড়ো আমির কাছেই একটুখানি এগোল তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুনবশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আটকা পড়ে যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলই জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এইজন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন আমরা যথার্থত পুত্রকে চাই নে আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিকমতো বুঝলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মুগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তখন উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথরোধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য বুঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি, তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না, প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে নিজেকে নয়। তখন কথা আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যখন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি—তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম ব'লে আমাদের সমস্ত মনকে কর্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয় উজ্জ্বল হয় তখনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন যখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয় সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে।

তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সংকারমন্ত্র হচ্ছে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।

বায়ু মধু বহন করছে, নদীসিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করছে। ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হ'ক, রাত্রি মধু হ'ক, উষা মধু হ'ক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হ'ক, সূর্য মধুমান হ'ক।

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জলস্থল-আকাশ, জড়জন্তু মনুষ্য সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্বত্রই প্রকাশ পায়। তখন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—এই মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারি। যা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সমস্তই সেই আনন্দরূপ সেই অমৃতরূপ। কোনো বস্তুই তখন আমি প্রকাশ হচ্ছি বলে আর অহংকার করে না প্রকাশ হচ্ছেন কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ। সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই। মৃত্যু অন্য সমস্তের কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১৫ ফাল্গুন ১৩১৫

বিশ্বাস

সাধনা-আরম্ভে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড়ো বাধা আছে—সেইটি কাটিয়ে উঠতে পারলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্ছে প্রত্যয়ের বাধা। অজ্ঞাতসমুদ্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে গিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই হচ্ছে কলম্বসের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরও অনেকেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছোতে পারত কিন্তু তাদের দীনচিত্তে ভরসা ছিল না; তাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল ছিল না যে, কূল আছে; এইখানেই কলম্বসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমুদ্রে যে পাড়ি জমাই নে, তার প্রধান কারণ আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে নি যে সে সমুদ্রের পার আছে। শাস্ত্র পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মুখে বলি হাঁ হাঁ বটে বটে, কিন্তু মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে-প্রত্যয় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। এইজন্য ধর্মসাধনটা নিতান্তই বাহ্যব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অনুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা তাতে উদ্বোধিত হয় নি।

এই বিশ্বাসের জড়তাবশতই লোককে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করি, আমরা বলি এতে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিসটা কী? না, পুণ্য হচ্ছে একটি হ্যাণ্ডনোট যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এই রকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল। কিন্তু সাধনার লক্ষ্যকে এইরকম বহির্বিষয় করে তুললে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না। সে একটা পারলৌকিক বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। সেই বৈষয়িকতা অন্যান্য বৈষয়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কখনোই বাহিরের কোনো স্থান নয়, যেমন স্বর্গ; বাহিরের কোনো পদ নয়, যেমন ইন্দ্রপদ; এমন কিছুই নয় যাকে দূরে গিয়ে সন্ধান করে বের করতে হবে, যার জন্যে পাণ্ডা পুরোহিতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য কী এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উত্তর বের করে নিতে হবে। কারও কোনো শোনা কথায়

এখানে কাজ চলবে না—কেননা এটি কোনো ছোটো কথা নয়, এটি একেবারে শেষ কথা। এটিকে যদি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চর্য ব্যাপার। এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য এই আমি এসেছি—আশ্চর্য এই চারিদিক।

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি একে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মুহূর্তে মৃত্যু এসে একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে?

এই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্যলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো—কেন? এ সমস্ত কী জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই—এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। আত্মাকেই সত্য করে পূর্ণ করে জানতে হবে।

আত্মাকে যেখানে জানলে সত্য জানা হয় সেখানে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি নে। এইজন্যে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌঁছোয় না।

আত্মাকে আমরা সংসারের মধ্যেই জানতে চাচ্ছি। তাকে কেবলই ঘর-দুয়োর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিই নে—এইজন্যে তাকে পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, কেবল কাঁদছি আর ভয় পাচ্ছি। মনে করছি এটা না পেলেই আমি মলুম, আর ওটা পেলেই একেবারে ধন্য হয়ে গেলুম। এটাকে এবং ওটাকেই প্রধান করে জানছি, আত্মাকে তার কাছে খর্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈন্যের বোঝাকেই ঐশ্বর্যের গর্বে বহন করছি।

আত্মাকে সত্য করে জানলেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাষ্পে ভয়ের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় করে দেখার দুর্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহংকারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞানজ্যোতির নির্মলতার মধ্যেই নিজেকে

জানবে। কামক্রোধলোভ যে-সমস্ত বিকারের অন্ধকার রচনা করে, তার থেকে আত্মা বিশুদ্ধ শুভ্র নির্মুক্ত পবিত্রতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার আসক্তির মৃত্যুবন্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মুক্তিলাভ করে সে নিজেকে অমর বলেই জানবে। সে জানবে কার প্রকাশের মধ্যে তার প্রকাশ সত্য—সেই আবিঃ সেই প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পরম প্রকাশ বলে নিজের সমস্ত দৈন্য দূর করে দেবে এবং অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একটি প্রসন্নতা লাভ করে সে স্পষ্ট জানতে পারবে যে চিরদিনের জন্য রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত ভয় হতে, সমস্ত শোক হতে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা হতে রক্ষা পেয়েছে।

আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে। দেখো, দেখো, নিরীক্ষণ করে দেখো, সমস্ত চেষ্টাকে শুদ্ধ করে সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখো। একটি চাকা কেবলই ঘুরছে তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দুটিকে অর্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেন নি বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহৃত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে। সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি যে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে—চাকার ঘূর্ণাগতির মধ্যে দেখা বড়ো শক্ত—কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখতে পারি।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

সংহরণ

আমাদের সাধনার দ্বিতীয় বড়ো বাধা হচ্ছে সাধনায় অনভ্যাস। কোনো রকম সাধনাতেই হয়তো আমাদের অভ্যাস হয় নি। যখন যেটা আমাদের সমুখে এসেছে সেইটের মধ্যেই হয়তো আমরা আকৃষ্ট হয়েছি, যেমন-তেমন করে ভাসতে ভাসতে যেখানে সেখানে ঠেকতে ঠেকতে আমরা চলে যাচ্ছি। সংসারের স্রোত আমাদের বিনা চেষ্টাতেই চলছে বলেই আমরা চলছি—আমাদের দাঁড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই।

কোনো একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অনুগত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুর্দিক হতে সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চাই করি নি। এইজন্যে তারা সকলেই হাতের বার হয়ে যাবার জো হয়েছে। কে কোথায় যে আছে তার ঠিকানা নেই—ডাক দিলেই যে ছুটে

আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে সব খাদ্য তাদের অভ্যস্ত এবং রুচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি জড় হয় নইলে কিছুতেই নয়।

নিজেকে চারিদিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। চিন্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁট বাঁধে না।

এরকম অবস্থায় যে কেবল সিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার সুখও নেই। এতে আছে কেবল জড়তার তামসিক আবেশমাত্র।

কারণ, যখন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তখন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে। তখন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখছি একবার তার উপর রাখছি এমনি করে কেবলই টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন কোথাও নামিয়ে রাখবার কোনো উপায় না পাই তখন কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেষে সেই কৃত্রিম আয়োজন-গুলোও দ্বিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুর্দিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলই জমে উঠতে থাকে, জীবনান্তকাল পর্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই নে।

তাই বলছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থাতেই একটা আনন্দ আছে সিদ্ধির কথা দূরে থাক্। মহৎলক্ষ্য অনুসরণে নিজের বিক্ষিপ্ততাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যেটুকু সচেষ্টতা থাকলে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি সেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে খয়ে গিয়ে থাকে তবে বড়ো বিপদ। যেমন করে হ'ক, বারংবার স্খলিত হয়েও সেই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুলতে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চলতে শেখে তেমনি করেই তাকে চলতে শেখাতে হবে। কেননা সিদ্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সত্য সেই বিশ্বাসটি জাগানো চাই, তার পরে লক্ষ্যটি বাইরে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে সেটি জানা চাই, তার পরে চাই সোজা পথ বেয়ে চলতে শেখা। স্থৈর্য এবং গতি দুই চাই। বিশ্বাসে চিত্ত স্থির হবে—এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

নিষ্ঠা

যখন সিদ্ধির মূর্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তখন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে—তখন থামায় কার সাধ্য। তখন শ্রান্তি থাকে না, দুর্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরম্ভেই সেই সিদ্ধির মূর্তি তো নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ পথটিও তো সুগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যখন জাগে, হৃদয় যখন পূর্ণ হয় তখন তো আর ভাবনা থাকে না, তখন তো পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না, তখন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যখন দূরে, হৃদয় যখন শূন্য সেই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের সহায় কে?

তখন আমাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। শুষ্ক চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মরুভূমির পথে যাদের চলতে হয় তাদের বাহন হচ্ছে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন—এর কিছুমাত্র শৌখিনতা নেই। খাদ্য পাচ্ছে না তবু চলছে। পানীয় রস পাচ্ছে না তবু চলছে। বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চলছে, নিঃশব্দে চলছে। যখন মনে হয় সামনে বুঝি এ মরুভূমির অন্ত নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই তখনও তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে কিছু না পেয়েও আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে কাঁটাগুল্মের মধ্যে থেকেও সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের মতো ছুটে আসে, তখন সে ধুলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মতো এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে?

একঘেয়ে একটানা প্রান্তর—মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে। সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়; হৃদয়কে ডাকাডাকি করি, হৃদয় সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভয়ানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চলতে পারে—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্ছেই অগ্রসর হচ্ছেই—প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আসছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ওই দেখো হঠাৎ একদিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস দেখা দেয়—সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার মধ্যে মধুফলগুচ্ছপূর্ণ খর্জুরকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা। সেই নিভৃত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্ছে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিন্তু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা তো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তখন আবার সেই কঠিন শুষ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি গুণ আছে, ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জমিয়ে রাখতে পারে। ঘোরতর নীরসতার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি, কিন্তু নিষ্ঠা হচ্ছে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বজ্রসার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়—সে মৃত্যুকেও ভয় করে না। এই আমাদের মরুপথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অন্তে এসে পৌঁছোয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহংকার করে না, কোনো দাবি করে না—সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করেই তার সুখ।

১৭ ফাল্গুন

নিষ্ঠার কাজ

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায় তা নয়, সে আমাদের কেবলই সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চলতে চলতে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আসতে থাকে। নিষ্ঠা কখনো ভুলতে চায় না—সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কী হচ্ছে। এ কী করছ। সে মনে করিয়ে দেয় ঠাণ্ডার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রৌদ্রের সময় যে কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে পিপাসার সময় উপায় কী হবে।

আমরা সমস্ত দিন কত রকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই—কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, এই

যে-জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে ব'লো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চ'লো না, যে জল পান করবার জন্যে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে খামকা পা ডুবিয়ে ব'সো না। আমরা যখন খুব আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা তুচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পর্যন্ত নেবে গিয়েছি তখনও সে আমাদের ভোলে না—বলে, ছি, এ কী কাণ্ড! বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়, তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে। সহজ কবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি। তখন স্খলন হওয়াই শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যখন থাকে না, তখন পদে পদে যতিপতন হয়; যেখানে থামবার নয় সেখানে আলস্য করি, যেখানে থামবার সেখানে বেগ সামলাতে পারি নে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই সে জেগেই আছে। সে বলে ও কী! ওই যে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল। ওই যে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখবার জন্যে তোমার চেষ্টা আছে। ওই যে শত্রুতার কাঁটা তোমার স্মৃতিতে বিঁধেই রইল। কেন, হঠাৎ গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্ছ এই পবিত্র নির্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মতো শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে যতই জানতে পাই ততই বক্ষের মধ্যে নির্ভর অনুভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গনি। যখন চরম সুহৃদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম সুহৃদরূপে থাকেন। তাঁর কঠোর মূর্তি প্রতিদিন আমাদের কাছে শুভ্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই চাঞ্চল্যবর্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনী আমাদের রিক্ততার মধ্যে শক্তি শান্তি এবং জ্যোতি বিকীর্ণ করে দারিদ্র্যকে রমণীয় করে তোলেন।

গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, তাদের সমুদ্রযাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না। তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মূর্তি দেখবার জন্যে ব্যস্ত ছিল; কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে, এই জন্যে দিন যতই যেতে লাগল সমুদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধৈর্য ততই বেড়ে উঠতে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা

ফিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোনো নিশ্চয় চিহ্ন না দেখতে পেয়েও নিঃশব্দে চলতে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তারা জাহাজ ফেরায় বা! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল, তীর যে আছে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না। তখন সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। তখন কলম্বসকে সকলেই বন্ধু জ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় সহায় কেউ নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়। বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই নে যাকে আমরা সত্যবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি। তখন সেই সমুদ্রের মাঝখানে সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আসবে, যখন তীরের পাখি তোমার মাস্তুলের উপর উড়ে বসবে, যখন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে তখন সাধুবাদ ও আনুকূল্যের অভাব থাকবে না; কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা—নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, আঘাতসহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠা—কোনো মতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে। সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে, সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।

১৭ ফাল্গুন

বিমুখতা

সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মা যিনি জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছেন—তিনি বড়ো প্রচ্ছন্ন হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ অগ্রসর হচ্ছেই সন্দেহ নেই—কেবল সে কাজ যে চলছে তা আমরা জানি নে বলেই নিরানন্দ আছে। সেই কাজে আমাদের যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিই নি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্যহীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্মা তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার আনন্দে প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই কাজ করছেন। তিনি আমার জীবনের একটি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারা-খচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথছেন, আবার সেই জ্যোতিষ্কপুঞ্জখচিত রাত্রিকে জ্যোতির্ময় আর একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন। আমার এই জীবনের মণিহার রচনায় তাঁর বড়ো আনন্দ। আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য শিল্পরচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দগ্ধ করতে

হচ্ছে, কত আঘাত করতে হচ্ছে—সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্তু যে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্মা দিন রাত্রি বসে কাজ করছেন সেদিকে আমি তো তাকালুম না—আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি হাসি গল্প করছি আর ভাবছি কোনো মতে দিন কেটে যাচ্ছে—যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা যেন মানবজীবনের নাট্যশালায় প্রবেশ করে যেদিকে অভিনয় হচ্ছে সেদিকে মূঢ়ের মতো পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। নাট্যশালার থামগুলো চৌকিগুলো এবং লোক-জনের ভিড়ই দেখছি। তার পরে যখন আলো নিবে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর কিছুই দেখতে পাই নে, অন্ধকার নিবিড়—তখন হয়তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কী করতে এসেছিলুম, কেনই বা টিকিটের দাম দিলুম, এই থাম চৌকির অর্থ কী, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কী করতে? সমস্তই ফাঁকি, সমস্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্ছে সে-দিকের কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করছেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করছেন—ওই থাম চৌকিগুলো যে বহিরঙ্গ মাত্র। ওইগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও—তখনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

যে কাণ্ডটা হচ্ছে সমস্তই যে অন্তরে হচ্ছে। এই যে অন্ধকার কেটে গিয়ে এখনই ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হচ্চে একি কেবলই তোমার বাইরে? বাইরেই যদি হত তবে তুমি সেখানে কোন্ দিক দিয়ে প্রবেশ করতে? বিশ্বকর্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্তে একেবারে অরুণরাগে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ সূর্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মতো মাথা তুলে উঠছে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে—তোমারই অন্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ। তোমারই এই জীবনের জমিতে তিনি এত সোনার সুতো রুপোর সুতো এত রং-বেরঙের সুতো দিয়ে অহরহ এতবড়ো একটা আশ্চর্য বুনানি বুনছেন—এ যে তোমার ভিতরেই—যা একেবারে বাইরে সে যে তোমার নয়।

তবে এখনই দেখো। এই প্রভাতকে তোমারই অন্তরের প্রভাত বলে দেখো, তোমারই চৈতন্যের মধ্যে তাঁর আনন্দ-সৃষ্টি বলে দেখো। এ আর কারও নয়, এ আর কোথাও নেই—তোমার এই প্রভাতটি একমাত্র তোমারই মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে একলামাত্র তিনিই রয়েছেন। তোমার এই সুগভীর নির্জনতার মধ্যে তোমার এই

অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা— দিনে রাত্রে অবিশ্রাম। এই আশ্চর্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একে কেবলই বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না অর্থ পাবে না।

যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলুম আমি তখন বালক। লণ্ডন থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে চড়লুম। তখন শীতকাল। সেদিন কুহেলিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন—বরফ পড়ছে। লণ্ডন ছাড়িয়ে স্টেশনগুলি বাম দিকে আসতে লাগল। যখন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম দিকে মুখ বাড়িয়ে সেই কুয়াশালিপ্ত অস্পষ্টতার মধ্যে কোনো একব্যক্তিকে ডেকে স্টেশনের নাম জেনে নিতে লাগলুম। আমার গম্য স্টেশনটি শেষ স্টেশন। সেখানে যখন গাড়ি থামল আমি বাম দিকেই তাকালুম—সে-দিকে আলো নেই প্ল্যাটফর্ম নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলুম। ক্ষণকাল পরেই গাড়ি আবার লণ্ডনের অভিমুখে পিছোতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কী হল। পরের স্টেশনে যখন থামল, জিজ্ঞাসা করলুম অমুক স্টেশন কোথায়? উত্তর শুনলুম সেখান থেকে তুমি যে এইমাত্র আসছ। । তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম এর পরের গাড়ি কখন পাওয়া যাবে? উত্তর পেলুম— অর্ধরাত্রে। গম্য স্টেশনটি ডান দিকে ছিল।

আমরা জীবনযাত্রায় কেবল বাঁ দিকের স্টেশনগুলিরই খোঁজ নিয়ে চলেছি। ডান-দিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত। একটার পর একটা পার হয়ে গেলুম। যে-স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই—ওই বামদিকেই— চেয়ে দেখলুম। দেখলুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পষ্ট। যে-সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে-সুযোগ কেটে গেল—গাড়ি ফিরে চলেছে। যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ আহ্লাদ অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন পাওয়া যাবে। এই যে সুযোগ পেয়েছিলুম ঠিক এমন সুযোগ কখন পাব—কোন্ অর্ধরাত্রে।

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে এমন একটা স্টেশন আছে। সেখানে যদি না নামি—সেখানকার প্ল্যাটফর্ম যেদিকে সেদিকে যদি না তাকাই তবে সমস্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিতান্ত কুহেলিকাবৃত নিরর্থক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কী আছে। কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠলুম, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চললুম, কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোথায় ছিল, ভোজের আয়োজনটা কোথায় হয়েছে, ক্ষুধা আমার কোন্‌খানে মিটবে, আশ্রয় আমি কোন্‌খানে পাব—সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়েই হতবুদ্ধি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল।

হে সত্য, আর কিছু নয়, যেদিকে তুমি, যেদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও—আমি যে কেবল অসত্যের দিকেই তাকিয়ে আছি। তোমার আনন্দলীলা-মঞ্চে তুমি সারি সারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছ—আমি তার উলটোদিকের অন্ধকারে তাকিয়ে ভেবে মরছি এ সমস্ত কী। তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবলই দেখছি মৃত্যু—তার কোনো মানেই ভেবে পাচ্ছি নে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। ঠিক তার ওপাশেই যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে-কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে? হে আবিঃ—তুমি যে প্রকাশরূপে নিরন্তর রয়েছ—সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই। আমি হতভাগ্য। সেইজন্য আমি কেবল তোমাকে রুদ্রই দেখছি—তোমার প্রসন্নতা যে আমার আত্মাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জানতেই পারছি নে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অন্ধকার দেখে কেঁদে মরে—একবার পাশ ফিরলেই জানতে পারে মা যে তাকে আলিঙ্গন করেই রয়েছেন। তোমার প্রসন্নতার দিকেই তুমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননী, তাহলেই এক মুহূর্তে জানতে পারব আমি রক্ষা পেয়েই আছি, অনন্তকাল আমার রক্ষা, নইলে অরক্ষা-ভয়ের কান্না কোনোমতেই থামবে না।

১৮ ফাল্গুন

মরণ

ঈশ্বরের সঙ্গে খুব একটা শৌখিন রকমের যোগ রক্ষা করার মতলব মানুষের দেখতে পাই। যেখানে যা যেমন আছে তা ঠিক সেইরকম রেখে সেইসঙ্গে অমনি ঈশ্বরকেও রাখবার চেষ্টা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হয় না। ঈশ্বরকে বলি, তুমি ঘরের মধ্যে এস কিন্তু সমস্ত বাঁচিয়ে এস—দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়, ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুল সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে ভেঙে না যায়। এ আসনটায় ব'সো না এটাতে আমার অমুক বসে, এ জায়গায় নয় এখানে আমি অমুক কাজ করে থাকি, এ ঘর নয় এ আমার অমুকের জন্যে সাজিয়ে রাখছি। এই করতে করতে সবচেয়ে কম জায়গা এবং সবচেয়ে অনাবশ্যক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্যে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্নাথকে কী দেবে। তাঁকে যা দেবে সে তো কখনো সে আর ভোগ করতে পারবে না সেইজন্যে সে যে

জিনিসের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন সরে না—যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও, চিরদিনের মতো দেবার কথায়, মন আকুল করে তুলতে লাগল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের সবচেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরাও ঈশ্বরের জন্যে কেবলমাত্র সেইটুকুই ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সবচেয়ে কম লোভ—যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্‌বৃত্তের উদ্‌বৃত্ত। ঈশ্বরের নামগাঁথা দুটো একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল, দুটি একটি সংগীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভালো বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল। বললুম বেশ হল, বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করলুম।

একেই আমরা বলি উপাসনা। যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না, তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সবচেয়ে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয়, নিজের অংশটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে ঘের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বরকে একপাই অংশের শরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে "যা দ্বয়লোকসাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"—যাতে দুই লোকেরই সাধনা হয় মানুষের সেই চাতুরীই চাতুরী।

কিন্তু যে-চাতুরী দুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ওই দুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভুলতে থাকে, তার চাতুরী ঘুচে যায়। যে-লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে বেড়ে চলতে থাকে। ঈশ্বরের জন্যে ওই যে একপাই জমি রেখেছিলুম যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মরুভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা করি। "আমি" জিনিসটা যে একটা মস্ত পাথর, তার ভার যে ভয়ানক ভার। যে-দিকটাতে সেই আমিটাকে চাপাই সেই দিকটাতেই যে ধীরে ধীরে সমস্তটাই কাত হয়ে পড়তে চায়। যদি রক্ষা পেতে চাও তবে ওইটেকেই একেবারে জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই ভালো হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশ্বরকে দিতে পারি তাহলেই দুইলোক রক্ষা হয়—চাতুরী করতে গেলে হয় না। তাঁর মধ্যেই দুই লোক আছে। তাঁর মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে একসঙ্গেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই। আর তাঁর সঙ্গে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই তাহলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না, সেটা বিষয়কর্মের নামান্তর হয়। বিষয়কর্মের যে গতি তারও সেই

গতি—অর্থাৎ তার মধ্যে নিত্যতার লক্ষণ নেই—তার মধ্যে বিকার আসে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দেয়।

ও সমস্ত চাতুরী ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণই আত্মসমর্পণ করতে হবে এই কথা-টাকেই পাকা করা যাক। আমার দুইয়ে কাজ নেই আমার একই ভালো। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে একটি সতীর লক্ষণ আছে, সে চতুরা নয়, সে যথার্থই দুইকে চায় না, সে একককেই চায়; যখন সে এককে পায় তখনই সে সমস্তকেই পায়।

একাগ্র হয়ে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সংকট এই যে, আজ পর্যন্ত সে জন্যে কোনো আয়োজন করা হয় নি। সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। জীবন এমনি ভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলে ঠুলে তাঁকে জায়গা করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে এসেছে।

পৃথিবীতে আর সমস্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়, যেখানে পাঁচজনের বন্দোবস্ত সেখানে ছজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয়, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সেরকম গোঁজা-মিলন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি "পুনশ্চ নিবেদনের" সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভুলেই থাকি তবে গোড়াগুড়ি সে ভুলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন অমনি এক রকম করে কাজ সেরে নেও এ-কথা তাঁর সম্বন্ধে কোনোমতেই খাটবে না।

ঈশ্বর-বিবর্জিত যে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তখনই বুঝতে পারি যখন তাঁর দিকে যেতে চাই। যখন তার মধ্যেই বসে আছি তখন সে যে আমাকে বেঁধেছে তা বুঝতেই পারি নে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যাস প্রত্যেক সংস্কারটিই কী কঠিন গ্রন্থি। জ্ঞানে তাকে যতই তুচ্ছ বলে জানি নে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে। একটা ছাড়ে তো দেখতে পাই তার পিছনে আরও পাঁচটা আছে।

সংসারকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এতদিন বহুযত্নে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি—তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিকড় জড়িয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই—তারা সবাই আমার। তাদের কোনোটাকেই একটু-মাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে আমি বাঁচব কী করে। তারা যে বাঁচবার জিনিস নয় তা বেশ জানি তবু চিরজীবনের সংস্কার তাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে এদের না হলে আমার চলবে না যে। ধনকে আপনার বলে জানা যে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক ওজনটি যে আজ বুঝব সে শক্তি কোথায় পাই। বহুদীর্ঘকাল ধরে আমির ভারে সেই ধন যে পর্বতসমান ভারি হয়ে উঠেছে, তাকে একটুও নড়াতে গেলে যে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে।

এইজন্যেই ভগবান বিশু বলেছেন, যে-ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মুক্তি অত্যন্ত কঠিন। ধন এখানে শুধু টাকা নয়, জীবন যা-কিছুকেই দিনে দিনে আপনার বলে সঞ্চয় করে তোলে, যাকেই সে নিজের বলে মনে করে এবং নিজের দিকেই আঁকড়ে রাখে—সে ধনই হ'ক আর খ্যাতিই হ'ক এমন কি পুণ্যই হ'ক।

এমন কি, ওই পুণ্যের সঞ্চয়টা কম ঠকায় না। ওর একটি ভাব আছে যেন ও যা নিচ্ছে তা সব ঈশ্বরকেই দিচ্ছে। লোকের হিত করছি, ত্যাগ করছি, কষ্ট স্বীকার করছি, অতএব আর ভাবনা নেই। আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশ্বরের উৎসাহ, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের কর্ম। কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকখানি নিজের দিকেই জমাচ্ছি সে খেয়ালমাত্র নেই।

যেমন মনে করো আমাদের এই বিদ্যালয়। যেহেতু এটা মঙ্গলকাজ সেই হেতু এর যেন আর হিসেব দেখবার দরকার নেই, যেন এর সমস্তই ঈশ্বরের খাতাতেই জমা হচ্ছে। আমরা যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙছি তার খোঁজও রাখি নে। এ বিদ্যালয় আমাদের বিদ্যালয়, এর সফলতা আমাদের সফলতা, এর দ্বারা আমরাই হিত করছি, এমনি করে এ বিদ্যালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্ছে। সেই সংগ্রহ আমার অবলম্বন হয়ে উঠছে, সেটা একটা বিষয় সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণে তার জন্যে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে, তার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী সাজাতেও ইচ্ছা করে। পাছে কেউ কোনো ত্রুটি ধরে ফেলে এই ভয় হয়—লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোলবার জন্যে একটু বিশেষভাবে ঢাকাঢুকি দেবার আগ্রহ জন্মে। কেননা এসব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাদ্য হয়ে উঠছে। এর থেকে যদি ঈশ্বর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের অভ্যাসে বিদ্যালয় থেকে এই যে-অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলছি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাচ্ছি নে। তখন ঈশ্বরকে আর আশ্রয় বলে মনে হবে না।

এইজন্যে সঞ্চয়ীর পক্ষেই বড়ো শক্ত সমস্যা। সে ওই সঞ্চয়কেই চরম আশ্রয় বলে একেবারে অভ্যাস করে বসে আছে, ঈশ্বরকে তাই সে চারিদিকে সত্য করে অনুভব করতে পারে না, শেষ পর্যন্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বসেছি—সে-সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেইজন্যে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে—কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনো রকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না—তার চেয়ে অসাধ্য আর কিছুই হতে পারে না। তবে কী করা কর্তব্য ?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে—তবেই নূতন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে।

এটা বেশ করে জানতে হবে, যে-জীবন আমার ছিল, সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে-লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে জেনেছিলুম একটি একটি করে একটু একটু করে তার থেকে মরতে হবে। এস মৃত্যু এস—এস অমৃতের দূত এস—

এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিলসিক্ত
এস গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এস গো চিত্তপাবন।
এস গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয় ;
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ-সাধন।

১৯ ফাল্গুন

ফল

ভিতরের সাধনা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন বাইরে তার কতকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে ; সে লক্ষণগুলি কীরকম তা একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মানুষ বরাবর নিজের সার্থকতার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। বস্তুত মানুষের লক্ষ্যসিদ্ধি, মানুষের চেষ্টার পরিণামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন জিনিস যদি

জগতে কোথাও থাকে তবে সে গাছের ফলে। নিজের কর্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

ফল জিনিসটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য—পরিণত মানুষটি তেমনি সমস্ত সংসার-বৃক্ষের শেষলাভ।

কিন্তু মানুষের পরিণতি যে আরম্ভ হয়েছে তার লক্ষণ কী? একটি আমফল যে পাকছে তারই বা লক্ষণ কী?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রান্তে একটু রং ধরতে আরম্ভ করেছে, তার শ্যামবর্ণ ঘুচবে ঘুচবে করছে—সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যখন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বলতা পায় না, কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণসাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমশ ঘুচে আসতে থাকে, চারিদিকে আকাশের আলোর যে রং সেই রঙের সঙ্গেই তার মিলন হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের রঙের পার্থক্য সে আর কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না—চারিদিকের নিবিড় শ্যামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠতে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আসে। আগে বড়ো শক্ত আঁট ছিল কিন্তু এখন আর সে কঠোরতা নেই। দীপ্তিময় সুগন্ধময় কোমলতা।

পূর্বে তার যে-রস ছিল সে-রসে তীব্র অম্লতা ছিল এখন সমস্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখন তার বাইরের পদার্থ সমস্ত বাইরেরই হয়, সকলেরই ভোগের হয়, সকলকে আহ্বান করে কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে। গভীরতর সার্থকতার অভাবেই মানুষের তীব্রতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়—সেই আনন্দের দৈন্যেই তার দৈন্য, সেইজন্যেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিস, তার আঁটি—যেটিকে বাইরে দেখাই যায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিশ্লিষ্টতা ঘটতে থাকে। সেটা যে তার নিত্যপদার্থ নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শস্ত অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক হতে থাকে, ছাল অনায়াসে শাঁস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, আবার তার শাঁসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল, তাও আলগা হয়ে আসে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আর অত্যন্ত এক

করে রাখে না—নিজের বাহিরের আচ্ছাদনের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আঁটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যখন নিজের ভিতরে নিজের অমরত্বকে লাভ করতে থাকেন, সেখানটি যখন সুদৃঢ় সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাঁর বাইরের পদার্থটি ক্রমশই শিথিল হয়ে আসতে থাকে—তখন তাঁর লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইরে।

তখন তাঁর ভয় নেই, কেননা তখন তাঁর বাইরের ক্ষতিতে তাঁর ভিতরের ক্ষতি হয় না। তখন শাঁসকে আঁটি আঁকড়ে থাকে না; শাঁস কাটা পড়লে অনাবৃত আঁটির মৃত্যু-দশা ঘটে না। তখন পাখিতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, ঝড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি শুকিয়ে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তখন আপন অমরত্বকে আপন অন্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে, তখন সে "অতিমৃত্যুমেতি"। তখন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে, অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না—নিজেকে সে শাঁস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোঁটা বলে জানে না—সুতরাং ওই শাঁস খোসা বোঁটার জন্যে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।

এই অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে—"য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

ভিতরে যখন সেই অমৃতের সঞ্চার হয় তখন অমরাত্মা বাইরেকে আর একান্তরূপে ভোগ করতে চায় না। তখন, তার যা গন্ধ, যা বর্ণ, যা রস, যা আচ্ছাদন তাতে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই—সে এ-সমস্তের মধ্যেই নিহিত থেকে একান্ত নির্লিপ্ত, এর ভালোমন্দ তার ভালোমন্দ আর নয়, এর থেকে সে কিছুই প্রার্থনা করে না।

তখন ভিতরে সে লাভ করে, বাইরে সে দান করে; ভিতরে তার দৃঢ়তা, বাইরে তার কোমলতা; ভিতরে সে নিত্যসত্যের, বাইরে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; ভিতরে সে পুরুষ, বাইরে সে প্রকৃতি। তখন বাইরে তার প্রয়োজন থাকে না বলেই পূর্ণভাবে বাইরের প্রয়োজন সাধন করতে থাকে, তখন সে ফলভোগী পাখির ধর্ম ত্যাগ করে ফলদর্শী পাখির ধর্ম গ্রহণ করে। তখন সে আপনাতে আপনি সমাপ্ত হয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সকলের জন্যে আপনাকে সমর্পণ করতে পারে। তখন তার যা-কিছু, সমস্তই তার প্রয়োজনের অতীত, সুতরাং সমস্তই তার ঐশ্বর্য।

২০ ফাল্গুন ১৩১৫

৭

সত্যকে দেখা

আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবঃস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্ছে, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্যঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মতো আকার ধারণ করে; এইজন্যে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেই রকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচ্ছে। চিত্ত তাতে সাড়া দিচ্ছে না, চারিদিকের দৃশ্য-গুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেইজন্যে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বৃথা কর্ম সৃষ্টিদ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তবে আমোদ পাই।

যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এই রকমই হয়। সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে মনকে হৃদয়কে কিছু দূর পর্যন্ত অধিকার করে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। এইজন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে, তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না। সূর্য উঠছে তো উঠছে, নদী বইছে তো বইছে, গাছপালা বাড়ছে তো বাড়ছে, প্রতিদিনের কাজ নিয়মমতো চলছে তো চলছে। সেইজন্যে এমন কোনো দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখি নে, এমন কোনো ঘটনা জানতে কৌতূহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন— তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে বিস্ময়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে

ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়, জগৎ একটা যন্ত্রের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না, প্রতিমুহূর্তেই এই অনন্ত আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্তা হতে নিঃসৃত হচ্ছে বিকীর্ণ হচ্ছে ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি জল ওষধি বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না—তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব এইজন্যই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।

৩ চৈত্র ১৩১৫

সৃষ্টি

এই যে আমরা কয়জন প্রাতঃকালে এইখানে উপাসনা করতে বসি—এও একটি সৃষ্টি। এর মাঝখানেও সেই সবিতা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা দু-চার জনে পরামর্শ করলুম, তার পরে একত্র হয়ে বসলুম, তার পরে রোজ রোজ এই রকম চলে আসছে।

ঘটনা এই বটে কিন্তু সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখলে এ একটি সামান্য ব্যাপার কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখলে এ বড়ো আশ্চর্য প্রতিদিনই আশ্চর্য। সত্য মাঝখানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামণ্ডলী নিরন্তর সৃষ্টি করছেন। আমরা মনে করছি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্যে বসে কাজ সেরে তার পরে অন্য কাজে চলে গেলুম, বাস চুকে গেল—কিন্তু এ তো ছোটো ব্যাপার নয়। আমরা যখন পড়ছি, পড়াচ্ছি, খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, তখনও এই আমাদের মণ্ডলীটির সৃষ্টিকর্তা এরই সৃষ্টিকার্যে রয়েছেন। সেই জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন, তিনি আমাদের এই কয় জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর উপকরণ সাজিয়ে তুলেছেন। তাঁর যেন আর অন্য কোনো কাজ নেই, বিশ্বসৃষ্টি তাঁর যত বড়ো কাজ এও যেন তাঁর তত বড়োই কাজ। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলই হচ্ছে, হচ্ছে, হয়ে উঠছে—দিনরাত, দিনরাত। আমরা

যখন ঘুমোচ্ছি তখনও হচ্ছে, আমরা যখন ভুলে আছি তখনও হচ্ছে। সত্য যখন আছে, তখন কিছুই হচ্ছে না, বা একমুহূর্তও তার বিরাম আছে এ কখনো হতেই পারে না।

বিশ্বভুবনের মাঝখানে একটি সত্যং বিরাজ করছেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভুবনকে তার যথাস্থানে যথানিয়মে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কয়জনের মাঝখানে একটি সত্যং কাজ করছেন বলেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা এখানে এসে বসেছি। বিশ্বভুবন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করছে। যেখানে আমাদের দূরবীন পৌঁছোয় না, মন পৌঁছোয় না, সেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বলছে নমোনমঃ। আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি, যিনি লোক-লোকান্তরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাঙ্গণে বসে আছেন; কেবল যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে যে বিশেষ সৃষ্টি চলছে তারও শক্তি বিকীর্ণ করছেন, আমাদের কয়েকজনের মনকে এই বিশেষ ব্যাপারে নানারকম করে চালাচ্ছেন, আমাদের কয়জনের প্রকৃতি সংস্কার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মুহূর্তেই একটি ঐক্যের মধ্যে গড়ে তুলছেন এবং আমরা যখন এখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যাব তখনও তিনি তাঁর এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝখানের সেই সত্যকে আমাদের উপাসনাজগতের সেই সবিতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে যাব। আমরা প্রত্যহ জেনে যাব, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনন্ত সৃষ্টি আমাদের কয়জনকে যে এখানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি সৃষ্টি। তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাজটিতে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই প্রকাশকে আমরা দেখে যাব।

৩ চৈত্র ১৩১৫

মৃত্যু ও অমৃত

সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর একবার নূতন পরিচয় হল।

জগৎটা গায়ের চামড়ার মতো আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পারল। সে যে

জগতের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নয় তার যে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা যেন অনুভব করতে পারলুম।

যাঁর মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন ভোগের আয়োজন—যা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা বহুপ্রকার সাজে সজ্জায় জাঁকেজমকে লোকের চক্ষুকর্ণকে ঈর্ষা ও লুব্ধতায় আকৃষ্ট করে আকাশে মাথা তুলেছিল তা একটি মুহূর্তেই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিথ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্মরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিন্তা করবার জন্যে বারবার উপদেশ করেছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারি নে এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে ত্যাগকে সহজ করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই গৌরবও নেই। যে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এখানকার টাকার বোঝা-টাকে জঞ্জালের মতো মাটিতে ফেলে দেওয়ার মধ্যে ঔদার্য কিছুই নেই। কোনোপ্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই অলীক বলে নিজের কাছে যথার্থই সপ্রমাণ করতে পারি তাহলে ধনজনমান তো মন থেকে খসে পড়ে একেবারেই শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্তু সেরকম ছেড়ে দেওয়া ফেলে দেওয়া নিতান্তই একটা রিক্ততা মাত্র। সে যেন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো—যা ছিল না তাকেই চমকে উঠে নেই বলে জানা।

বস্তুত সংসার তো মিথ্যা নয়, জোর করে তাকে মিথ্যা বলে লাভ কী। যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। সূর্যালোকে তো কোনো কালিমা পড়ে নি—আকাশের নীল নির্মলতায় মৃত্যুর চাকা তো ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারে নি; অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্‌টা? এই সংসারকে আমার বলে জানা। এর একটি সূচ্যগ্র বিন্দুকেও আমার বলে আমি ধরে রাখতে পারব না। যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ওই আমার উপরেই সমস্ত জিনিসের প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই বালির উপর ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমস্তই ধুলায় পড়ে ধূলিসাৎ হয়।

আমি বলে যে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিসকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়—তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে, কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।

অতএব মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা কিছু দেবার সে কাকে দেব? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখবে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখতে পারবে না।

যে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমস্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মুখ তাকিয়ে খেটে মরে। মৃত্যুর সময় তার সেই ভোগস্ফীত ক্ষুধার্ত অহং কপালে হাত দিয়ে বলে সমস্তই রইল পড়ে কিছুই নিয়ে যেতে পারলুম না।

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই যদি চিরন্তন বলে না জানি তাহলেই যথেষ্ট হল না—কারণ, সেরকম বৈরাগ্যে কেবল শূন্যতাই আনে। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে যে এই সংসারটা থাকবে। অতএব আমার যা কিছু দেবার তা শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হবে ত্যাগের দ্বারা নয়;—আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না সে দিতে চায়, এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিচ্ছেন, তিনি নিজের জন্যে কিছুই নিচ্ছেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সখারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে, নিজের ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টানবে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই সত্য যদি তা দান করি—যদি তা নিজে নিতে চাই তো সমস্তই মিথ্যা। সেই কথাটা যখন ভুলি তখন সমস্তই উলটা-পালটা হয়ে যায়—তখনই শোক দুঃখ ভয়, তখনই কাম ক্রোধ লোভ। তখনই, স্রোতের মুখে যে নৌকা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেত, উজানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্য আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। যে জিনিস স্বভাবতই দেবার তাকে নেবার চেষ্টা করার এই পুরস্কার। যখন মনে করি যে নিজে নিচ্ছি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে—এবং সেই সঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরকে তাদের খোরাকিস্বরূপ হৃদয়ের রক্ত জোগাতে থাকি।

৪ চৈত্র

তরী বোঝাই

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্যে গীতা বলেছেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে ওই সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।

৪ চৈত্র

স্বভাবকে লাভ

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কী? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কী? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয় সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে তাহলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি, দেব, তখনই আমাদের আনন্দের দিন। তখনই সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব ?

ওই যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে-কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে-কৃপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয় কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে, না জন্মায় না মরে। কিন্তু ওই অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে ; কিছু না পারে তো অন্তত তার ওই নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, একে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেখব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বলব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, তার ধন জন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বলব না যে এ সমস্ত আমি পাচ্ছি আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বারবার করে বলব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না বলে আবর্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি।

এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্ছি।

অহং-এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া—এইজন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের সৃষ্টি হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর একটা বেগ কেবলই ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, ভারি একটা সংকট ঘনিয়ে ওঠে। আত্মা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে, সে অনন্তের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারিদিকে ঘানির বলদের মতো পাক খায়। সে চলে অথচ এগোয় না—সুতরাং এ চলায় কেবল তার কষ্ট, এতে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

৫ চৈত্র

অহং

তবে অহং আছে কেন? এই অহং-এর যোগে আত্মা জগতের কোনো জিনিসকে আমার বলতে চায় কেন?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তার জন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে।

আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা সৃষ্টি করতে পারি নে।

তখন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে আমার বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়।

শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়, সে উপকরণকে বিশেষ-

ভাবে সাজায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে? যদি কিছুই তার "আমার" না থাকে তবে সে দেবে কী?

অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার "আমার" করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেন জগতের মধ্যে যেটুকুকেই আমার আত্মা এই অহং-এর গণ্ডি দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে তাকে তিনি আমার বলতে দেবেন—কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই দরিদ্র হয়ে থাকবে। সে দেবে কী? বিশ্বভুবনের কিছুকেই তার আমার বলবার নেই।

ঈশ্বর ওইখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হয়েছেন। বাপ যেমন ছোটো শিশুর সঙ্গে কুস্তির খেলা খেলতে খেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুস্তির খেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে; তেমনি ঈশ্বর আমাদের মতো অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন, এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বলতে দেন যে আমাদেরই জিত, বলতে দেন যে আমার শক্তিতেই হল, বলতে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন আমারই সসাগরা বসুন্ধরা।

তা যদি না দেন তবে তিনি যে-খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়। সেইজন্য তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমুদ্রের উপরে তুমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ তোমাকে!

এই যে তিনি আমার বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্যটি কী?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম। আত্মার যথার্থস্বরূপ হচ্ছে আনন্দময়স্বরূপ—সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল—যখন আমার ঘড়ায় তুলে

আনি তখন সে আমার জল, তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাও গে তাহলে জল দান করা হল না—যদিচ সে জল প্রচুর বটে, এবং নদীও হয় তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডূষ দিলেও সেটা জল দান করা হল।

বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন, হাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই "আমার" বলবার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মায় না।

তবেই দেখা যাচ্ছে, অহং-এর ধর্মই হচ্ছে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নেয়। পেলুম বলে যতই তার গৌরব বোধ হয় ততই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর যদি এই রকম সব জিনিসেই নিজের নাম নিজের সিলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাকত তাহলে আত্মার যথার্থ কাজটি চলত না, সে দরিদ্র এবং জড়বৎ হয়ে থাকত।

কিন্তু অহং-এর এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার আনন্দময়স্বরূপ কোথায়? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।

তখন ডালির ফুল নিয়ে আত্মা পূজা করতে পায় না। অহং বলে এ সমস্তই আমি নিলুম।

সে মনে করে আমি পেয়েছি। কিন্তু ডালির ফুল তো বনের ফুল নয় যে, কখনো ফুরোবে না, নিত্যই নূতন নূতন করে ফুটবে। পেলুম বলে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ফুল তখন শুকিয়ে যাচ্ছে। দুদিনে সে কালো হয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়, পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে যায়।

তখন বুঝতে পারি পাওয়া জিনিসটা নেওয়া জিনিসটা কখনোই নিত্য হতে পারে না। আমরা পাব নেব, আমার করব, কেবল দেওয়ার জন্য। নেওয়াটা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ্য—অহংটা কেবল অহংকারকে বিসর্জন করতে হবে বলেই। নিজের

দিকে একবার টেনে আনব বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি সে তো নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্যে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।

তাই বলছিলুম অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন আত্মাকে বলতে হবে, না ও আমার নয়, ও আমি নেব না। ও সমস্তই বাইরে রাখতে হবে, বাইরে দিতে হবে, ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুলব না। অহং-এর এই সমস্ত নিরন্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কারণ এই বদ্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়, আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ নন, তিনি সৃষ্টির দ্বারাই মুক্ত, কেননা তিনি নিচ্ছেন না তিনি দিচ্ছেন, আত্মাও তেমনি অহং-এর রচনা দ্বারা বদ্ধ হবার জন্যে হয় নি, এই রচনাগুলিদ্বারাই সে মুক্ত হবে, তার আনন্দস্বরূপ মুক্ত হবে, কারণ এইগুলিই সে দান করবে। এই দানের দ্বারাই তার যথার্থ প্রকাশ। ঈশ্বরেরও আনন্দরূপ অমৃতরূপ বিসর্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেই জন্য অহং তখনই আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয়, যখন আত্মা তাকে উৎসর্গ করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।

৬ চৈত্র

নদী ও কূল

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনাসংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করছে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি তাহলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাকবে এমন আশঙ্কা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বললেই সে মিথ্যা হয় না তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সত্য, সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ-রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তাহলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে—এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারিদিকেই বড়ো হয়ে উঠে আত্মাকে বলতে থাকে—তুমি চলতে পাবে না, তুমি এইখানেই থেকে যাও; তুমি এই ধন-দৌলতেই থাকো, এই ঘরবাড়িতেই থাকো, এই খ্যাতি প্রতিপত্তিতেই থাকো।

যদি আত্মা আটকা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না, সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকালপাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কূলের দ্বারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ—অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের

মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ-পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সংগীত।

কিন্তু যখনই উপকূলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আনুগত্য না করে, তখনই গতির সহায় না হয়ে সে গতি রোধ করে। তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। যেটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা অবরুদ্ধ হয়। তখন উপকূল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকূলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে। নিজেকে দানের দ্বারা যে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বহুতর শুষ্কবালুময় বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। তবু মরে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে।

৭ চৈত্র

আত্মার প্রকাশ

প্রকাশ এবং যাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে, সেই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের দ্বারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্মের সঙ্গে সংগত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকত তাহলে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকত তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকত তাহলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ, সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকত তাহলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায়? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই—সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।

মনে করো একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে, ছোটো মাপকাঠি কী করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্ত্বকে প্রকাশ করে। না, ক্রমাগতই সেই স্তব্ধ দৈর্ঘ্যের পাশে পাশে চঞ্চল হয়ে

অগ্রসর হতে হতে। সে প্রত্যেকবার অগ্রসর হয়ে বলে, না এখনও শেষ হল না। সে যদি চুপ করে পড়ে থাকত তাহলে বৃহত্ত্বের সঙ্গে কেবলমাত্র নিজের বৈপরীত্যটুকুই জানত কিন্তু সে নাকি চলেছে এই চলার দ্বারাই বৃহত্ত্বকে পদে পদে উপলব্ধি করে চলেছে। এই চলার দ্বারা মাপকাঠি ক্ষুদ্র হয়েও বৃহত্ত্বকে প্রচার করছে। এইরূপে ক্ষুদ্রে বৃহত্তে বৈপরীত্যের মধ্যে যেখানে একটা সামঞ্জস্য ঘটছে সেইখানেই ক্ষুদ্রের দ্বারা বৃহত্তের প্রকাশ হচ্ছে।

জগৎও তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়—তার মধ্যে নিরন্তর একটি অভিব্যক্তি আছে একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চলতে চলতে সে ক্রমাগতই বলছে আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না। এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে। রূপ কেবলই বলে, একে আমি বাঁধতে পারলুম না, এ আমাকে নিরন্তর ছাড়িয়ে চলছে। এই জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার পক্ষে রুদ্ধ দ্বার নয়। সে যেন তার রাজপথের বিজয়তোরণের মতো, তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে করতে সে চলে যাচ্ছে, এগুলি কেবল তার গতির পরিমাপ করছে মাত্র। অহং নিয়ত চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপছে আর কেবলই বলছে—না, একে আমি সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারলুম না। সে যেমন সব জিনিসকেই বদ্ধ করে রাখতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁধতে চায়। বদ্ধ করতে চাওয়াই তার ধর্ম। অথচ একেবারে বদ্ধ করে রাখা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বদ্ধ করা তার প্রবৃত্তি তেমনি বদ্ধ করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন সর্বনেশে জিনিস আর কী হত।

তাই বলছিলুম অহং আত্মাকে যে কেবলই বাঁধছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাই সে আত্মার মুক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করছে। যদি না বাঁধত তা হলে এই মুক্তির প্রকাশ কোথায় থাকত, যদি না ছেড়ে দিত তাহলেই বা কোথায় থাকত?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে, এইটেই হচ্ছে ওর সামঞ্জস্য। অহং সে কথা ভোলে—সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্যে। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে দুঃখ দেয় ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে কিন্তু ফল আত্মসাৎ করবে না, দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তখন ভাষা নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায়, ভাব ম্লান হয়ে যায়।

যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেই জন্যে তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্বান বলি নে—তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করছে, বাধাগ্রস্ত করছে না।

এইজন্যেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অসত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি। আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি, আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায়, মোহমুক্ত নির্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত খেতে খেতে হাতড়ে না বেড়ায়, সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে তোমার মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে; নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে; মানবজীবনকে একেবারে নিরর্থক করে না দেয়।

৮ চৈত্র

আদেশ

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না। তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সেরকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বরাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিমভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ, সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। সূর্যকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মানুষকেও তাই বলেছেন। সূর্য তাই জ্যোতির্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে-কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্ছে, সেইখানেই কুঁড়ি মুষড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্ছে—সেইখানেই বন্ধন বিকার বিনাশ।

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ—সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন তুমি লোভ ক'রো না, হিংসা ক'রো না, বিলাসে আসক্ত হ'য়ো না। যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম। তাঁর

সেই ধর্ম পরিপূর্ণ, কেননা তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কী হব? পরমাত্মার মতো সেই স্বরূপটি লাভ করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভু। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্‌রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্ষুব্ধ করে লুব্ধ করে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখাবে না।

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে-প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে, যে-প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে-প্রার্থনা, যে-প্রার্থনার যুগযুগান্তরব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ করো, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হ'ক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক—সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্যে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।

বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন—এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

৯ চৈত্র

সাধন

আমরা অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করছি যে, আমরা ঈশ্বরকে পাচ্ছি নে কেন? আমাদের মন বসছে না কেন? আমাদের ভাব জমছে না কেন?

সে কি অমনি হবে, আপনি হয়ে উঠবে? এতবড়ো লাভের খুব একটা বড়ো সাধনা নেই কি? ঈশ্বরকে পাওয়া বলতে কতখানি বোঝায় তা ঠিকমতো জানলে এ সম্বন্ধে বৃথা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়।

ব্রহ্মকে পাওয়া বলতে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তাহলে কোনো কথাই ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া তো অমন একটি ছোটো ব্যাপার নয়। তার জন্যে শিক্ষা হল কই? তার জন্যে সমস্ত চিত্তকে একমনে নিযুক্ত করলুম কই? তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানতে চাও, এই যে উপদেশ সে-উপদেশের মতো তপস্যা হল কই।

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা নাম শোনাই তপস্যা? জীবনের অল্প একটু উদ্‌বৃত্ত জায়গা তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্যা? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব নিকেশ করে নেবার তাগাদা কর। বল যে, এই তো উপাসনা করছি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন? এত সস্তায় কোন্ জিনিসটা পেয়েছ?

কেবল পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার উপযুক্ত হবার জন্যে কী তপস্যাই না করতে হয়েছে? বাপ মার কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা, শত্রুর কাছে শিক্ষা, ইস্কুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা; রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন। সেজন্য ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংযত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠি নি,—কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজসাধনা চলেইছে।

সমাজবিহারের জন্য যদি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা তবে ব্রহ্মবিহারের জন্য বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই চারিটি কথা শুনে বা দুই চারিটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে।

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে সে-ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোটো জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছুই নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও বড়ো—বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিসই বড়ো।

এইটি মনে রাখতে হবে প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুলতে হবে।

সমাজের জন্য আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা তো একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি—শরীর সমাজের উপযোগী লজ্জাসংকোচ করতে শিখেছে। তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন

অনুসারে শায়েস্তা হয়ে এসেছে। সভাস্থলে স্থির হয়ে বসতে তার আর কষ্ট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখলে হাসিমুখে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেষ্টা করতে হয় না। সমাজের সঙ্গে মিলে থাকবার জন্যে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা অনেক ঘৃণা ভয় এমন করে গড়ে তুলতে হয়েছে যে, সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছে; এমন কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয় হৃদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্যও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করছি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি, সে প্রশ্ন এখন থাক্।

প্রথমে শরীরটাকে তো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের চোখ মুখ হাত পাকে এমন করতে হবে যে, পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে একেবারে সংস্কারের মতো হয়ে আসবে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্বে চক্ষু আপনি লজ্জিত হবে—যে-ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি শুব্ধ হবে। এর জন্যে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তনুকে ভাগবতী তনু করে তুলতে হবে—এ তনু তপোবনের সঙ্গে কোথাও বিরোধ করবে না, অতি সহজেই সর্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ ভগবানের যে-ইচ্ছা সর্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ-দ্বেষ লোভ-ক্ষোভ ভুলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দিতে হবে। সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোচ্ছি না কেন সে যেমন অসংগত বলা, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্বার্থবেষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপের দ্বারা ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন, এ প্রশ্নও তেমনি অদ্ভুত।

১০ চৈত্র

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থ ই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিন্নমাদিয়ে, যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না। এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন—ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি। শীলসকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন।

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞূপ্পসত্থানি, অপরামট্ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি।

অর্থাৎ

আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে।

এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারংবার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলছেন তা "মঙ্গল সুত্তে" কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই,

বহূ দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে,

বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন,

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো, পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু-উপট্ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো,
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্‌সতা সমণানঞ্চ দস্‌সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্‌সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট্ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি

এই রকম যারা করেছে, তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছোনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে নয় নয় নয় বলতে বলতে একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উলটা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে—মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা—সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা-সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তিং ভাবনা—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু; সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হ'ক, শত্রুহীন হ'ক, অহিংসিত হ'ক, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধসম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হ'ক।

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রিভাবনা সত্য হয় না—এইজন্য শীল-গ্রহণ শীল-সাধন প্রয়োজন। কিন্তু শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এ তো শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মত্থ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজূ চ সুহুজূচ,
সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্সকো চ সুভরো চ,
অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্টহৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হ'ক নিরাপদ হ'ক সুস্থ হ'ক।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথূলা।
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।

ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে অবশেষে সকলেই সুখী আত্মা হ'ক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিমঞ্‌ঞেথ কত্থচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্‌ঞা
নঞ্‌ঞ মঞ্‌ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা ক'রো না—কোথাও কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা ক'রো না।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসংভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

ঊর্ধ্বে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্য
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে

ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, একপুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই যে হচ্ছে। বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই—সকলের চেয়ে বড়োকেই—জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন—তাকে ছোটো করে ঝাপসা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু এ তো আমরা একেবারে পারব না। এইদিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কিনা, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কিনা, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কিনা তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে আমার শীল অখণ্ড আছে অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে আর একদিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ চৈত্র

পূর্ণতা

আর এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ-কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেইদিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে।

এই সম্পূর্ণতার যে একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসো; বলেছেন, প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পৌঁছোতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন, শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু যাঁরা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা তো সংসারী লোকের দুর্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এতদূর পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ।

অতএব এই বড়ো লক্ষ্য এবং বড়ো পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহস দেবে। নিজের অন্তরতর মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করে তুলবে।

লক্ষ্যকে অসত্যের দ্বারা কেটে ক্ষুদ্র করলে, উপায়কে দুর্বলতার দ্বারা বেড়া দিয়ে সংকীর্ণ করলে তাতে আমাদের ভরসাকে কমিয়ে দেয়—যা আমাদের পাবার তা পাই নে, যা পারবার তা পারি নে।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে যখন মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তখন তাঁরা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধ আমাদের কারও প্রতি অশ্রদ্ধা অনুভব করেন নি, যখন তিনি বলেছেন—মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি যখন তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি। তখন আমরা ভূমাকে পাবার এই দুরূহ পথকে অসাধ্য পথ বলি নে—তখন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁদের মাভৈঃ বাণী অনুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাযাত্রায় আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করি। যিশুর বাণী অত্যুক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসত্যের সম্পূর্ণতাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করো।

একবার ভিতরের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো—প্রতি দিন কোন্‌খানে ঠেকছে। একজন মানুষের সঙ্গেও যখন মিলতে যাচ্ছি তখন কত জায়গায় বেধে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অহংকারে ঠেকছে, স্বার্থে ঠেকছে, ক্রোধে ঠেকছে, লোভে ঠেকছে—অবিবেচনার দ্বারা আঘাত করছি, উদ্ধত হয়ে আঘাত পাচ্ছি। কোনোমতেই সেই নম্রতা মনের মধ্যে আনতে পারছি নে যার দ্বারা আত্মসমর্পণ অত্যন্ত সহজ এবং মধুর হয়। এই বাধা যখন স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাচ্ছি তখন আমার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাতে আমাকে একটি মানুষের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিলতে দেবে না তাতেই যে ব্রহ্মের সঙ্গেও মিলনের বাধা স্থাপন করবে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন, যাতে শত্রুকে আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্য ব্রহ্মবিহারের কথা বলবার সময় সংসারের কোনো কথাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জো নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিছুই বাঁচিয়ে বলেন নি—হাতে রেখে কথা কন নি। তাঁরা বলছেন একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাঁতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহংকারের দিকে স্বার্থের দিকে আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে

প্রেমের দিকে পরমাত্মার দিকে অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। যাঁরা এই মহাপথে যাত্রা করবার জন্য মানবকে নির্ভর দিয়েছেন একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

১২ চৈত্র

নীড়ের শিক্ষা

এই অপরিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমাত্মার কোনো উপলব্ধি নেই, এ-কথা বললে মানুষের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে। এতদিন তাহলে খোরাক কী? মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?

শিশু মাতৃভাষা শেখে কী করে? মায়ের মুখ থেকে শুনতে শুনতে খেলতে খেলতে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেখে—ততটুকুই সে প্রয়োগ করতে থাকে। তখন তার কথাগুলি আধো-আধো, ব্যাকরণ-ভুলে পরিপূর্ণ। তখন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে যতটুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও খুব সংকীর্ণ। কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেখবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষে ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মে না পাকা হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাকবে না, ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বলতেও পারবে না—তা হলে ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে যে কেবল কষ্টকর হবে তা নয় তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

শিশু মুখে মুখে যে ভাষা গ্রহণ করছে, ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিখে নিতে হবে, সেটাকে সর্বত্র পাকা করে নিতে হবে, কেবল সাধারণভাবে মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে নয়, তাকে গভীরতর, উচ্চতর, ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখায় ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে রীতিমত চর্চার দ্বারা শিক্ষা করতে হবে। একদিকে পাওয়া আর-একদিকে শেখা। পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের থেকে প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে—আর শেখাটা নিয়মে, কর্মে; সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা দুটোই যদি পাশাপাশি না চলে, তাহলে হয় পাওয়াটা কাঁচা হয় নয় শেখাটা নীরস ব্যর্থ হতে থাকে।

বুদ্ধদেব কঠোর শিক্ষকের মতো দুর্বল মানুষকে বলেছিলেন এরা ভারি ভুল করে,

কাকে কী বোঝে, কাকে কী বলে তার কিছুই ঠিক নেই। তার একমাত্র কারণ এরা শেখবার পূর্বেই পাবার কথা তোলে। অতএব আগে এরা শিক্ষাটা সমাধা করুক তাহলে যথাসময়ে পাবার জিনিসটা এরা আপনিই পাবে—আগেভাগে চরম কথাটার কোনো উত্থাপনমাত্র এদের কাছে করা হবে না।

কিন্তু ওই চরম কথাটি কেবল যে গম্যস্থান তা তো নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে। ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয় ও যে গতিও দেবে।

অতএব আমরা যতই ভুল করি যাই করি, কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মানতে পারব না। কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখব এ চলবে না, মায়ের কাছেও শিক্ষা পাব।

মায়ের কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাৎ হয়ে থাকে, সেই সুযোগটুকু কি ছাড়া যায়?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে খেতে হবে সন্দেহ নেই, একদিন তাকে নিজের ডানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মার মুখ থেকে সে খাবার খায়। যদি তাকে বলি, যে পর্যন্ত না চরে খাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্যন্ত খেতেই পাবে না তাহলে সে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশক্ত আছি ততদিন যেমন অল্প অল্প করে শক্তির চর্চা করব তেমনি প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রসাদের জন্যে ক্ষুধিত চঞ্চুপুট মেলতে হবে; তাঁর কাছ থেকে সহজ কৃপার দৈনিক খাদ্যটুকু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে। এ ছাড়া উপায় দেখি নে।

এখন তো অনন্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি, এখন তো নীড়েই পড়ে আছি। ছোটোখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামান্য বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রম। এই আশ্রমের মধ্যে বদ্ধ থেকেই অনন্ত আকাশ হতে আহরিত খাদ্যের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আমাদের কী দশা হবে?

তুমি বলতে পার ওই খাদ্যের দিকেই যদি তুমি তাকিয়ে থাক তাহলে চিরদিন নিশ্চেষ্ট হয়েই থাকবে, নিজের শক্তির পরিচয় পাবে না।

সে-শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলি নে। ওড়বার প্রয়াসে দুর্বল পাখা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু কৃপার খাদ্যটুকু প্রেমের পুষ্টিটুকু প্রতিদিনই সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সেটি যদি নিয়মিত লাভ করি তাহলে যখনই পুরোপুরি বল পাব তখন নীড়ে ধরে রাখে এমন সাধ্য কার? দ্বিজ-শাবকের স্বাভাবিক ধর্মই যে অনন্ত আকাশে ওড়া।

তখন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসারনীড়ে বাস করবে বটে কিন্তু অনন্ত আকাশে বিহার করবে।

এখন সে অক্ষম ডানাটি নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কল্পনাও করতে পারে না যে আকাশে ওড়া সম্ভব। তার যে শক্তিটুকু আছে সেইটুকুকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেখলেও সে কেবল ডালে ডালে লাফাবার কথাই মনে করতে পারে। সে যখন তার কোনো প্রবীণ সহোদরের কাছে আকাশে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদা একটি অত্যুক্তি প্রয়োগ করছেন—যা বলছেন তার ঠিক মানে কখনোই এ নয় যে সত্যিই আকাশে ওড়া। ওই যে লাফাতে গেলে মাটির সংস্রব ছেড়ে যেটুকু নিরাধার ঊর্ধ্বে উঠতে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তাঁরা আকাশে ওড়া বলে প্রকাশ করছেন—ওটা কবিত্বমাত্র, ওর মানে কখনোই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসারনীড়ের মধ্যে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বুদ্ধদেব যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন ভগবান যিশু যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন, তাকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারি নে।

কিন্তু এ-সব আশ্চর্য কথা তাঁদেরই কথা যাঁরা জেনেছেন যাঁরা পেয়েছেন। সেই আশ্বাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা দ্বিজশাবক, সে আকাশে ওড়বার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে সেই বার্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন শ্রদ্ধা রক্ষা করি, তাঁদের বাণীকে আমরা যেন খর্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যখন তাঁর প্রসাদসুধা চাইব সেই সঙ্গে এই কথাও বলব আমার ডানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো। আমি কেবল আনন্দ চাই নে শিক্ষা চাই, ভাব চাই নে কর্ম চাই।

১৩ চৈত্র

ভূমা

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব; তখন তিনি বললেন, তোমার ও সব কথায় কাজ কী? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড়ো দুঃখে পড়েছ, তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখতে পার না, যা রাখ তাতে তোমার আশা মেটে না। এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার

উপায় করে তবে অন্য কথা। এই বলে দুঃখনিবৃত্তিকেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, একান্ত দুঃখনিবৃত্তিকেই তো মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পষ্ট দেখছি দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়।

আল্‌প্‌স্ পর্বতের দুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্যে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কিন্তু বিনা কারণে মানুষ সেই দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কী? তার কারণ এই যে, দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্ধা আছে। আমি দুঃখ সইতে পারি। আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে এ-কথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্ছে বড়ো হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেকজাণ্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল দুর্গম নদীগিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিগ্বিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে? ঠিক রাজ্যলোভ নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা। বড়ো হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে-লোক লক্ষপতি হবে বলে দিন রাত টাকা জমাচ্ছে—বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই, লাভক্ষতির নিরন্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই—সে কীজন্যে এই অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে? ধনের পথে যতদূর সম্ভব বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ-কথা বলা মিথ্যা যে তোমাকে দুঃখনিবারণের পথ বলে দিচ্ছি। তাকে এ-কথাও বলা মিথ্যা যে ভোগের বাসনা ত্যাগ করো, আরামের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখো না। ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে।

বুদ্ধদেব যে দুঃখ-নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে-পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়োরকম করে ত্যাগ, খুব বড়োরকম করে ব্রতপালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যিই এমন কোনো একটা জায়গায় মানুষ ঠেকতে পারত যেখানে একান্ত দুঃখনিবৃত্তির শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই তাহলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে দুঃখের সন্ধানে বেরোতে হত।

অতএব মানুষকে যখন বলি দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তখন সে রাগ করে বলতে পারে, চাই নে আমি দুঃখনিবৃত্তি। ওর চেয়ে বড়ো কিছু একটাকে দিতে হবে কারণ মানুষ বড়োকেই চায়।

সেইজন্যে উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং। অর্থাৎ সুখ সুখই নয় বড়োই সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এই বড়োকেই জানতে হবে এঁকেই পেতে হবে। এই কথাটির তাৎপর্য যদি ঠিকমতো বুঝি তাহলে কখনোই বলি নে যে, চাই নে তোমার বড়োকে।

কেননা, টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে আমার সব পাওয়া হল।

অতএব যিনি ব্রহ্ম যিনি ভূমা যিনি সকলের বড়ো তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করলেই কী আর না করলেই কী। এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দূর করো, শুচি হও; সবল হও— আগে কঠোর সাধনার সুদীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু পাই তাহলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অনুষ্ঠানটিই দেবতা হয়ে ওঠে; পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মানুষ কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে, ব্যাকরণ যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

দুধে তেঁতুল দিয়ে সেই দুধকে দধি করবার চেষ্টা করলে হয়তো বহু চেষ্টাতেও সে দুধ না জমে উঠতে পারে, কিন্তু যে দইয়ে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখতে দেখতে দুধ সহজেই দই হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে, সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে স্বভাবের সহজ নিয়মে পরিণাম সুসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা যাঁকে সাধনার দ্বারা চাই, গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ

করে দিতে হবে, তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন। তাহলে চলাও আনন্দ, পৌঁছনোও আনন্দ হয়ে উঠবে। তাহলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসৎ থেকে সৎ হয় না, একেবারে না পাওয়া থেকে পাওয়া হয় না—এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরূপে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন, তিনিই কৃপারূপে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে যাবেন।

১৪ চৈত্র

৮

ওঁ

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বললেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালোও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্বত্রই সন্ধান করে দেখলেন, সর্বত্রই খণ্ডতা আছে সর্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌছোলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখছে কানও শুনছে নাসিকাও ঘ্রাণ করছে। এর মধ্যে যে কেবল একটা "হাঁ" এবং অন্যটা "না" হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় হাঁ হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস, অঞ্জলি ভরে উঠল।

ছান্দোগ্য বলছেন মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই ওঁ। যেখানে একদিকে ঋক্ একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে সুর, একদিকে সত্য একদিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সংগীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নি, যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্বে সে নিজের পরম পরিতৃপ্তি স্বীকার করতে পারে না; তাকে ঠেকতে হয়, তাকে ঠকতে হয়, মনে করে ইন্দ্রিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ।

শেষকালে দেখে, এর সব তাতেই পাপ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, "না" তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে উপনিষৎ সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের একদিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্য দিকটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করেন নি। সেইজন্যে তিনি যেমন বলেছেন

এতজ্‌ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

অর্থাৎ

আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই।

তেমনি আবার বলেছেন,—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

অর্থাৎ—

সেই ধীরেরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্রেই।

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃস্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও সৃষ্টি করছেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যই তিনি ওঁ।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যাকেই সংসারকেই একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে, আবার যারা বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিদ্যা আর একদিকে অবিদ্যা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর-একদিকে সংসার। এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেই-খানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দূরের দ্বারা নিকট বর্জিত নিকটের দ্বারা দূর বর্জিত, চলার দ্বারা থামা বর্জিত থামার দ্বারা চলা বর্জিত, অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জিত বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তৎ সর্বস্যা

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি, কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্য তিনি ওঁ।

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। একদিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করছেন আর-একদিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষদ বলেন—

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকা
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎসকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংশ্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পরকে কাটতে চায় কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মানতে চায় না, তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থকে মানতে চায় না, কিন্তু মাঝখানে যেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থই তোমার স্বার্থ। তিনি শিব, তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয় তিনি এক। তার মানে এ নয় যে, তবে এ সমস্ত কিছুই নেই। তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলছি, আমি তুমি নয়, তুমি বলছ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্।

মিথুন যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্ছেন তিনি—কেউ যেখানে বর্জিত হয় নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়, যা চন্দ্রে নয় সূর্যে নয় মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য মানুষে, যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে, সেই একেকেই, সেই হাঁকেই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্ছে ওংকার।

১৫ চৈত্র

স্বভাবলাভ

মানুষের এক দিন ছিল যখন, সে যেখানে কিছু অদ্ভুত দেখত সেইখানে ঈশ্বরের কল্পনা করত। যদি দেখলে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠছে অমনি সেখানে পূজার আয়োজন করত। তখন সে কোনো একটা অসামান্য লক্ষণ দেখে বা কল্পনা করে বলত, অমুক মানুষে দেবতা ভর করেছেন, অমুক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমুক মূর্তিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছেন।

ক্রমে অখণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্বত্র এক বলে দেখবার শিক্ষা মানুষের হল তখন সে জানতে পারল যে, যাকে অসামান্য বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্য নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেখবার অধিকার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রয় পেল। তখনই মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশস্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ধর্ম থেকে সমাজ থেকে রাজ্য থেকে মূঢ়তা ক্ষুদ্রতা দূর হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্রহ্মকে সর্বত্র দেখা, স্বভাবে দেখা।

কিন্তু সমস্ত স্বভাব থেকে চুরি করে এনে তাঁকে স্বেচ্ছাপূর্বক কোনো একটা কৃত্রিমতার মধ্যে বিশেষ করে দেখবার চেষ্টা এখনও মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি কেউ কেউ স্পর্ধা করে বলেন সেইরকম করে দেখাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট দেখা। সব রূপ হতে ছাড়িয়ে একটি কোনো বিশেষরূপে, সব মানুষ হতে সরিয়ে একটি কোনো বিশেষ মানুষে ঈশ্বরকে পূজা করাই তাঁরা বলেন পূজার চরম।

জানি, মানুষ এরকম কৃত্রিম উপায়ে কোনো একটা হৃদয়বৃত্তিকে অতিপরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে, কোনো একটা রসকে অত্যন্ত তীব্র করে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু সেইটে করাই কি সাধনার লক্ষ্য?

অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ হলে স্পর্শশক্তি অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সেইরকম একদিকের চুরির দ্বারা অন্যদিককে উপচিয়ে তোলাকেই কি বলে শক্তির সার্থকতা? যেদিকটা নষ্ট হল সেদিকটার হিসাব কি দেখতে হবে না? সেদিকের দণ্ড হতে কি আমরা নিষ্কৃতি পাব?

কোনোপ্রকার বাহ্য ও সংকীর্ণ উপায়ের দ্বারা সম্মোহনকে মেসমেরিজিমকে ধর্ম-সাধনার প্রধান অঙ্গ করে তুললে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে স্বভাব থেকে সুতরাং

মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব—আমরা যেদিকটাতে এইরকম অসংগত ঝোঁক দেব সেইদিকটাকেই বিপর্যস্ত করে দেব।

বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে—এই তো তার পাপের মূল এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কী? প্রবৃত্তিকে উন্মূলন করা নয় প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোনো একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপ প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জনস্পৃহা যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জনের দিকেই মানুষের শক্তিকে একান্ত বাঁধতে চায় তখনই সেটা লোভ হয়ে দাঁড়ায়। তখনই সে মানুষের চিত্তকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো করে। এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে-ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় সে কখনোই যথার্থ মঙ্গলকে পায় না সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মানুষের প্রতি অনুরাগ যখন স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুত করে তখনই তা কাম হয়ে ওঠে। সেই কাম আমাদের ঈশ্বরলাভের বাধা।

এইজন্য সামঞ্জস্য থেকে বিকৃতি থেকে মানুষের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্ছে ধর্মনীতির একান্ত চেষ্টা।

উপনিষদে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলবার সময় যখন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তখন তার তাৎপর্য এই। তিনি স্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সংকীর্ণতায় আকৃষ্ট আবদ্ধ করে অন্যত্র থেকে পরিহরণ করে নেয় না—এই গুণেই তিনি সর্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে কোনো একটাকেই স্ফীত করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য থাকে না তা নয়, চারিদিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্মনীতিতে আমরা এই যে স্বভাবলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত আছি, সমাজ এবং নীতিশাস্ত্র এজন্যে দিনরাত তাড়না করছে। এইখানেই কি এর শেষ? ঈশ্বরসাধনাতেও কি এই নিয়মের স্থান নেই? সেখানেও কি আমরা কোনো একটি ভাবকে কোনো একটি রসকে সংকীর্ণ অবলম্বনের দ্বারা অতিমাত্র আন্দোলিত করে তোলাকেই মানুষের একটি চরম লাভ বলে গণ্য করব?

দুর্বলের মনে একটা উত্তেজনা জাগিয়ে তার হৃদয়কে প্রবুদ্ধ করবার জন্যে এই সকল উপায়ের প্রয়োজন এমন কথা অনেকে বলেন।

যে লোক মদ খেয়ে আনন্দ পায় তার সম্বন্ধে কি আমরা ওইরূপ তর্ক করতে পারি?

আমরা কি বলতে পারি মদেই যখন ও বিশেষ আনন্দ পায় তখন ওইটেই ওর পক্ষে শ্রেয়।

আমরা বরং এই কথাই বলি যে যাতে স্বাভাবিক সুখেই মাতালের অনুরাগ জন্মে সেই চেষ্টাই উচিত। যাতে বই পড়তে ভালো লাগে, যাতে লোকজনের সঙ্গে সহজে মিশে ওর সুখ হয়, যাতে প্রাত্যহিক কাজকর্মে ওর মন সহজে নিবিষ্ট হয় সেই পথই অবলম্বন করা কর্তব্য। যাতে একমাত্র মদের সংকীর্ণ উত্তেজনায় ওর চিত্ত আসক্ত না থেকে জীবনের বৃহৎ স্বভাবক্ষেত্রে সহজভাবে ব্যাপ্ত হয় সেইটে করাই মঙ্গল।

ভগবানের ধারণাকে একটা সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে ভক্তির উত্তেজনাকে উগ্র নেশার মতো করে তোলাই যে মনুষ্যত্বের সার্থকতা এ-কথা বলা চলে না। ভগবানকেও তাঁর স্বভাবে পাবার সাধনা করতে হবে তাহলেই সেটা সত্য সাধনা হবে—তাঁকে আমাদের নিজের কোনো বিকৃতির উপযোগী করে নিয়ে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাকেই আমরা মঙ্গল বলতে পারব না। তার মধ্যে একটা কোথাও সত্য চুরি আছে। তার মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জস্য আছে যে, যে-ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব সেখানে মোহকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। যিনি শক্ত লোক তিনি মদ সহ্য করতে পারেন তাঁর পক্ষে একরকম চলে যায় কিন্তু তাঁর দলে এসে যারা জমে তাদের আর কিছুই ঠিক-ঠিকানা থাকে না; তাদের আলাপ ক্রমেই প্রলাপ হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা উন্মাদনার পথে অপঘাত মৃত্যু লাভ করে।

১৬ চৈত্র

অখণ্ড পাওয়া

ব্রহ্মকে পেতে হবে। কিন্তু পাওয়া কাকে বলে?

সংসারে আমরা অশন বসন জিনিস পত্র প্রতিদিন কত কী পেয়ে এসেছি। পেতে হবে বললে মনে হয় তবে তেমনি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে মনে করি তবে তো পাচ্ছি নে। তখন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও যাতে আমাদের অন্যান্য পাওয়ার শামিল হয় সেই চেষ্টা করতে চাই। অর্থাৎ আমাদের আসবাবপত্রের যে ফর্দটা আছে, যাতে ধরা আছে আমার ঘোড়া আছে গাড়ি আছে আমার ঘটি আছে বাটি আছে তার মধ্যে ওটাও ধরে দিতে হবে আমার একটি ভগবান আছে।

কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখার দরকার এই যে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কী? সে কি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আরও একটা বড়ো জিনিসকে যোগ করবার আকাঙ্ক্ষা?

তা কখনোই নয়। কেননা যোগ করে করে জুড়ো করে আমরা যে গেলুম। তেমনি করে সামগ্রীগুলোকে নিয়তই জোড়া দেবার নিরন্তর কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্যেই কি আমরা ঈশ্বরকে চাই নে? তাঁকেও কি আবার একটা তৃতীয় সামগ্রী করে আমাদের বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে জোড়া দিয়ে বসব? আরও জঞ্জাল বাড়াব?

কিন্তু আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মকে চায় তার মানেই হচ্ছে, সে বহুর দ্বারা পীড়িত এইজন্য সে এককে চায়, সে চঞ্চলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এইজন্য সে ধ্রুবকে চায়, নূতন কিছুকে বিশেষ কিছুকে চায় না। যিনি নিত্যোঽনিত্যানাং, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েই আছেন সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। যিনি রসানাং রসতমঃ, সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রসতম, তাঁকেই চায়; আর-একটা কোনো নূতন রসকে চায় না।

সেইজন্যে আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ যে, ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারাই আবৃত করে দেখবে। আর-একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিস সন্ধান বা নির্মাণ করবে না। এই হলেই আত্মা আশ্রয় পাবে আনন্দ পাবে।

এমনি করে তো নিখিলের মধ্যে তাঁকে জানবে। আর ভোগ করবে কী? না, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, তিনি যা দান করছেন তাই ভোগ করবে। মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং, আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে তেমনি তুমি যা কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জানতে হবে। তা হলেই কী হবে? না, তুমি যা কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরও কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সে রকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি। তাহলেই অল্পই হবে বহু, তাহলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড়ো করে কখনোই অসীমকে পাওয়া যায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌঁছোনো যেতে পারে না। জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং আমাদের অসংখ্য ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমতো জানতে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।

১৭ চৈত্র

আত্মসমর্পণ

তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেননা তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন—তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে অতএব আর-এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ-কথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে—সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন কি, বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এইজন্যই বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড়ো সত্তা বড়ো আনন্দ যদি কিছুই না থাকে তাহলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরন্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তাহলে তো আমাদের এই অহং এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই একেবারে পরম লাভ—তাহলে একে আঁকড়ে না রেখে এত করে নষ্ট করব কেন?

কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা ক্ষমা দ্বারা সন্তোষের দ্বারা সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাচ্ছি নে কেন, আমরা যেন বলতে পারি তাঁকে দিচ্ছি নে কেন? আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

> আমার যা আছে আমি, সকল দিতে
> পারি নি তোমারে নাথ।
> আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান
> সুখ দুখ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খরচ করে ফেলো, তাহলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মতো
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।

আমাদের যত দুঃখ যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছি নে বলেই—সেইটে ঘুচলেই যে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়—নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করি নে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। আমার শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন, তাঁরই আনন্দ, শক্তিরূপে ছোটো বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং সুখ সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—কেননা যিনি স্বয়ম্ভু, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।

১৮ চৈত্র

সমগ্র এক

পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপ যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে? তা কখনোই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেননা আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্ছে তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুদ্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসতমকে সেই পরমানন্দস্বরূপকে চাচ্ছে—নইলে তার তৃপ্তি নেই।

জীবাত্মা যা কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

নিজের মধ্যে আমরা কী কী দেখছি।

প্রথমে দেখছি আমি আছি—আমি সত্য।

তার পরে দেখছি যেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনও হই নি তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে ছুঁতে পারি নে কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

একে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়—সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে বর্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়—যা চিন্তা করি নি ভবিষ্যতে করব তার সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিন্তা করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্তমান, তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিদ্যমান, যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি ভাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করছে তা নয়, এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাখছে। এ এমন করে কাজ করছে যাতে আমাদের শরীরের "আজ"ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায় শরীরের "কাল"ও আপনার দাবি রক্ষা করতে পারে—তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্যাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্যে হাত মাথা পেট সকলেই খাটছে আবার হাত মাথা পেটের জন্যেও পা খেটে মরছে। এই

শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্ছে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করছে, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করছে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করছে, ধারণ করছে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা তো নয়, কেবল যে তার দ্বারা যন্ত্রের মতো রক্ষাকার্য চলে যাচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে। সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জানছে আমি হচ্ছি আমি; আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আমি।

শুধু জানছে নয় এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালোবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহ্য করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে, রাখছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরে দেখতে পাচ্ছি এই যে সমগ্রতা যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে অর্থাৎ সত্তা কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্ছে ও পরিণতি লাভ করছে তা নয়, তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালোবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি, ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজ-সত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবৎ জড় শাসনে ঘটে উঠছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে

একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পরের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমময় যোগরূপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয় আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করছে; মানুষ অন্ধভাবে নয় সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করছে। এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে, এই চৈতন্য যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র আমির সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আনন্দ; বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ দুর্বলতা। তাই উপনিষৎ বলেছেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গলরূপে আছে তা নয় সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরূপে বিরাজ করছে। এই বিশ্বের সমগ্রতাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিরনির্ঝরধারারূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কোনোদিন সে আর নিঃশেষ হল না।

এইজন্যেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন, সে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলতে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিলতে হবে—তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।

১৯ চৈত্র

আত্মপ্রত্যয়

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্য বুদ্ধি হৃদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই যে সমগ্রতা সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জানে এবং নিজেকে ভালোবাসে।

শুধু তাই নয় এইজন্য সর্বত্রই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়—সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা কিছু চায় তা কোনো-না-কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারিদিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে আমরা জগতের আর সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে

বুঝতে পারি, মানবকে এক বলে বুঝতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে এক বলে বুঝতে পারি— এমন কি, সেই রকম এক করে যাকে না বুঝতে পারি তার তাৎপর্য পাই নে—তাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি কেবল হাতড়ে বেড়াতে থাকে।

অতএব আমরা যে পরম এককে খুঁজছি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থামতে পারে না।

আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আত্মা— মানবকে এক বলে জানি সেই জানার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা—বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম্ বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা। এইজন্যই উপনিষৎ বলেন, সাধক—আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি— আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ, আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে খোঁজে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। এইজন্যই পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম এককে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

২১ চৈত্র

ধীর যুক্তাত্মা

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা—একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং এককেই আমরা বহুর মধ্যে সর্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন কি, শিশু যখন নানা জিনিসকে ছুঁয়ে শুঁকে খেয়ে দেখবার

জন্যে চারিদিকে হাত বাড়াচ্ছে তখনও সে সেই এককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরাও শিশুরই মতো নানা জিনিসকে ছুঁচ্ছি শুঁকছি মুখে দিচ্ছি, তাকে আঘাত করছি তার থেকে আঘাত পাচ্ছি, তাকে জমাচ্ছি এবং তাকে আবর্জনার মতো ফেলে দিচ্ছি। এই সমস্ত পরীক্ষা এই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত দুঃখে সমস্ত লাভে আমরা সেই একককেই চাচ্ছি। আমাদের জ্ঞান একে পৌঁছোতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিলতে চায়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানাকালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানারূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না—ওঁ। বলতে পারছে না—হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন চারিদিকে মাথা ঠুকতে থাকি উঁচট খেতে থাকি, তখন কত ছোটো জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিসকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি এই তো পেয়েছি। তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—অমনি এতদিনের এত খোঁজা এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি যে, যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো জিনিস স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল, তখন যে-জিনিসের ঠিক যে-ব্যবহার তা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল, তখন জিনিসগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তাদের অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্মে সেই এককে সেই আসল জিনিসটিকে পেলেই সমস্তই সহজ হয়ে যায়—জিনিসের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লাঘব হয়ে যায়। সাঁতারটি যেমনি জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন অতল জলে ডুব দিলেও বিনাশে তলিয়ে যাই নে, আপনি ভেসে উঠি। এই সাঁতারটি না জানলেই জল প্রতিপদে আমাকে বাধা দেয় আমাকে মারতে চায়। যে জলে সঞ্চরণ সাঁতার জানলে আমার পক্ষে লীলা আমার পক্ষে আনন্দ, সাঁতার না জানলে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে দুঃখ আমার পক্ষে মৃত্যু। তখন অল্প জলেও হাত-পা ছুঁড়ে হাঁসফাঁস করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

আমাদের আসল জানবার বিষয়কে পাবার বিষয়কে যেমনি লাভ করি অমনি এই সংসারের বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না, মারতে পারে না। তখন, পূর্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ হয়ে যায়—সংসারে তখন আমরা মুক্তভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকার করি। তখন, পূর্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ বিক্ষেপ যে-শক্তির অপব্যয় ছিল সেটা কেটে যায়।

সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন, তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি, সেই সর্বব্যাপীকে যাঁরা সকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্য লাভ করেন, আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্‌ভ অপ্রমত্ত ধীর হন। তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন। নিজেকে কোনো অহংকার কোনো আসক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না, একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বহুর মধ্যে প্রবেশ করেন, সমস্ত বহু তখন তাঁদের পথ ছেড়ে দেয়।

সেই সকল ধীর সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অনুসরণ করব। সেই হচ্ছে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্ছে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।

২২ চৈত্র

শক্ত ও সহজ

সাধনার দুই অঙ্গ আছে। একটি ধরে রাখা আর একটি ছেড়ে দেওয়া। এক জায়গায় শক্ত হওয়া, আর এক জায়গায় সহজ হওয়া।

জাহাজ যে চলে তার দুটি অঙ্গ আছে। একটি হচ্ছে হাল, আর একটি হচ্ছে পাল। হাল খুব শক্ত করেই ধরে রাখতে হবে। ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সিধে পথ ধরে চলা চাই। এর জন্যে দিক জানা দরকার, নক্ষত্র পরিচয় হওয়া চাই, কোন্‌খানে বিপদ কোন্‌খানে সুযোগ সে সমস্ত সর্বদা মন দিয়ে বুঝে না চললে চলবে না। এর জন্যে অহরহ সচেষ্ট সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জন্যে জ্ঞান এবং শক্তি চাই।

আর একটি কাজ হচ্ছে অনুকূল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা। জাহাজের যত পাল আছে সমস্তকে এমন করে ছড়িয়ে ধরা যে বাতাসের সুযোগ হতে সে যেন লেশমাত্র বঞ্চিত না হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তেমনি। যেমন একদিকে নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং শক্তিকে সচেষ্ট রাখতে হবে তেমনি আর-একদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে একেবারে সহজ হয়ে যেতে হবে।

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাখবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায় কিন্তু নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখতে পাই। এখানেও মানুষের যেন একটা কৃপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখতে চায়, ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন নিজের শক্তির পরিচয় পায়। প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে যে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতখানি চলা হল। এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নয় যে, আমি যা করছি সমস্তই তিনি করছেন এইটি কল্পনা করা। করছি কাজ আমি, অথচ নিচ্ছি তাঁর নাম, এবং দায়িক করছি তাঁকে—এমন দুর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশ্বরের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাখতে হবে। সেটিকে সম্পূর্ণ মানতে হবে। কাত হয়ে সেটিকে পাশ কাটিয়ে চললে হবে না। তাঁর আহ্বান তাঁর প্রেরণাকে পুরাপুরি গ্রহণ করবার মুখে জীবন প্রতিমুহূর্তে যেন আপনাকে

প্রসারিত করে রাখে। "কী ইচ্ছা প্রভু, কী আদেশ" এই প্রশ্নটিকে জাগ্রত করে রেখে সে যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। যা শ্রেয় তা যেন সহজেই তাকে চালায় এবং শেষ পর্যন্তই তাকে নিয়ে যায়।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ শ্লোকের মানে এমন নয় যে আমি ধর্মেই থাকি আর অধর্মেই থাকি তুমি আমাকে যেমন চালাচ্ছ আমি তেমনি চলছি। এর ভাব এই যে আমার প্রবৃত্তির উপরেই যদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায় না, অধর্ম থেকে নিরস্ত করে না; তাই হে প্রভু, স্থির করেছি তোমাকেই আমি হৃদয়ে রাখব এবং তুমি আমাকে যেদিকে চালাবে সেই দিকে চলব। স্বার্থ আমাকে যেদিকে চালাতে চায় সেদিকে চলব না, অহংকার আমাকে যে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিবৃত্ত হব না।

অতএব তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রত্যহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হ'ক।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও, সকলের পিছনে এসে দাঁড়াও, সকলের নীচে গিয়ে বসো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশ্বরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা সুমধুর অমৃত-ফলভারে সার্থক হউক। সর্বদা লড়াই করে নিজের জন্যে ওই একটুখানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কী দরকার, তার কী মূল্য? জগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লজ্জা ক'রো না—সেইখানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হার-জিত তোমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেক তরঙ্গটি কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটিরই প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।

তাই বলছিলুম জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চা যতই করি, ঈশ্বরের চিরপ্রবাহিত অনুকূল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভুলি যেন।

২৪ চৈত্র

নমস্তেঽস্তু

কোনো লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আশ্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সরু সরু শিকড় মেলে দিয়ে আশ্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলম্বনকে ঘিরে ফেলে।

আমরাও যে-সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে যতরকম সম্বন্ধসূত্রেই আমরা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মূলে তিনিই আছেন। যে-রসের দ্বারা সেই সেই সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই। এইজন্যে সব সম্বন্ধই তাঁতে খাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মানুষ তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্ছে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।

পিতা যত বড়োই হ'ন আর পুত্র যত ছোটোই হ'ক, উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড়ো বাপকে লাভ করে।

ঈশ্বরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে, নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবেন, আমাদের আপন হয়ে উঠবেন না।

তিনি তো কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি; তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না, তা হলে আপন কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ সূর্যকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আপন করে এত লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব ঘুচিয়ে মাঝখানে রয়েছেন, তেমনি তিনিই নিজে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের সম্বন্ধরূপে বিরাজ করছেন। নইলে একের সঙ্গে আরের ব্যবধান যে অনন্ত; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাকতেন তাহলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কী করে!

অতএব তিনি দুরূহ তত্ত্বকথা নন তিনি অত্যন্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরন্তন অখণ্ড আপন। গাছের ফলকে তিনি যে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা নয়, স্বাদে গন্ধে শোভায় তিনি বিশেষরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন। তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রসে আমার আপন করেছেন, নইলে ফলনামক সত্যটিকে আমি কোনোদিক থেকেই কোনো রকমেই এতটুকুও নাগাল পেতুম না।

কিন্তু আপন যে কতদূর পর্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্যন্ত, তা তিনি মানুষের সম্বন্ধে মানুষকে দেখিয়েছেন—শরীর মন হৃদয় সর্বত্র তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেইজন্যে মানুষের এই সম্বন্ধগুলির মধ্য দিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি আমাদের নিত্যকালের আপন তিনি আমাদের কী? সেই তিনি তাঁকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না। তার চেয়ে চরমতর অন্তরতর কথা হচ্ছে, তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার বিদ্যা, আমার ধন, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব। তুমি আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিতা নোঽসি, তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র, তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা।

এই যে যোগ, এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সম্পূর্ণ সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, পিতা নোবোধি, তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো—পিতা নোঽসি, পিতা আছ; কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না—পিতা নোবোধি, তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি আমাকে দাও।

আমার চৈতন্য ও বুদ্ধি যোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্ছি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি—ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের ধীশক্তিসকল প্রেরণ করছেন। যিনি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব! কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এই বোধটুকু পাই যে তিনিই দিচ্ছেন।

তিনিই পিতারূপে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে থাকলে তবেই তাঁকে আমি যথার্থভাবে নমস্কার করতে পারি। আমি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছি পাচ্ছি, তবু তাঁকে নমস্কার করতে পারছি নে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্ধত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ সেটা আমার বোধে খুঁজে পাচ্ছি নে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই যে, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কারটি যেন হয়। সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এসে নামে। আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নমস্কাররূপে পরিণত হয়।

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্কারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর। এ জলভারনত মেঘের মতো, ফলভারনত শাখার মতো রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই নমস্কারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্যে উপচে পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবিড় মাধুর্য তা নয় এ প্রবল শক্তি। এ যেমন অনায়াসে গ্রহণ করে ও বহন করে উদ্ধত অহংকার তেমন করে পারে না। একে কেউ পরাভূত করতে পারে না। জীবন এই নমস্কারের দ্বারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জয়ী হয়। এই নমস্কারের দ্বারা জীবনের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লঘু হয়ে যায়, পাপ তার উপর দিয়ে মুহূর্তকালীন বন্যার মতো চলে যায়, তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এইজন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমার নমস্কার হউক। সুখ আসুক দুঃখ আসুক, নমস্তেঽস্তু। মান আসুক অপমান আসুক, নমস্তেঽস্তু। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তুমি রক্ষা করছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জেনেই—নমস্তেঽস্তু। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকালের অধীশ্বর তুমিই পিতা নোঽসি এই জেনেই—নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। আমাকেই বড়ো বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করি।

২৬ চৈত্র

মন্ত্রের বাঁধন

বীণায় কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইস্পাতের, কোনো তার মোটা, কোনো তার সরু, কোনো তার মধ্যম সুরে বাঁধবার, কোনো তার পঞ্চমে। কিন্তু তবু বাঁধতে হবে, তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ সুর জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে সব মাটি।

জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ সুর বাজাতে হবে।

সূর্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা-না-একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে। মানুষের জীবনকেও কি এই চির-উদ্‌গীত সংগীতে যোগ দিতে হবে না?

কিন্তু এখনও এই জীবনটাকে তারের মতো বাঁধি নি। এর মধ্যে এখনও কোনো গানের আবির্ভাব হয় নি। এ জীবন সূত্রবিচ্ছিন্ন বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অকৃতার্থ হয়ে আছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিত্য সুরকে ধ্রুব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে?

ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বাঁধবার সম্বন্ধ আছে, তার মধ্যে নিজের মনের মতো একটি কিছু স্থির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দেয় না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বেঁধে দেয়, সেই সঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়। সেই মন্ত্র মনের মধ্যেও গ্রন্থি বাঁধতে থাকে।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিতা নোঽসি।

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি কাজ করছি বিশ্রাম করছি এই পর্যন্তই। কিন্তু অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো

লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ওই মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ওই মন্ত্রটি বারংবার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্‌, পিতা নোঽসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জানুক কারও কাছে গোপন না থাক্‌।

ভগবান যিশু ওই সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলে নি—সে কেবলই বলেছে, পিতা নোঽসি।

সেই যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে, পিতা নোঽসি।

হে পিতা, আমি যে তোমার পুত্র এই সুরটি ঠিকমতো প্রকাশ করা বড়ো কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। পুত্র যে পিতারই প্রকাশ। সন্তানের মধ্যে পিতাই যে স্বয়ং সম্ভূত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুলতে পারি তবে তো এই সুর বাজবে না যে, পিতা নোঽসি।

সেইজন্যেই এই আমার প্রতিদিনের একান্ত প্রার্থনা হ'ক, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু।

২৭ চৈত্র

প্রাণ ও প্রেম

পিতানোঽসি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছ থেকে গ্রহণ করব। যিনি পিতা তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বলব, তুমি যে পিতা, সে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

পিতার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ সে তো কোনো তৈরি করা সম্বন্ধ নয়। রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের একটা পরস্পর বোঝাপড়া আছে, সেই বোঝাপড়ার উপরেই তাদের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ বাহ্যিক নয় সে একেবারে আন্তরিক সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পুত্রের অস্তিত্বের মূলে। অতএব এই গভীর আত্মীয়

সম্বন্ধ কোনো বাহ্য অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না, কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজনিত কর্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।

পিতার সঙ্গে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায়? প্রাণের মধ্যে। পিতার প্রাণই সন্তানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন—কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ? প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

জগতে কোনো প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলছে সে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগৎজোড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন—যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, বিশ্বে এই যা কিছু চলছে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃৎপিণ্ডেও তেমন, ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনোই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ওই নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্ছে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই পেতে পারতুম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত। সেইজন্তেই সর্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধ-কারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেঁদে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতিমুহূর্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ, চৈতন্য, ধীশক্তি লাভ করছি। এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয় এই কথাটিকে ভক্তিদ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ওই মন্ত্র সার্থক হবে, ওঁ পিতা নোহসি। আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ, মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বললে এত বড়ো কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, একে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে এই কথাটি নিজেকে ভালো করে জানাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছে তা নয়। তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেবল যে একটা চেষ্টা আছে গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে। আমরা কেবল বেঁচে আছি কাজ করছি নয়, আমরা রস পাচ্ছি। আমাদের দেখায় শোনায়, আহারে বিহারে, কাজে কর্মে, মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে নানা সুখ নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্ছি? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন? এটা কেবল আমার এই একটি ছোটো কারখানাঘরের সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে তৈরি হচ্ছে?

তা নয়। বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্যেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে নানা স্নেহে সখ্যে শ্রদ্ধায় জোয়ারের বেগের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়ছে, এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেন আমরা বলি, ওঁ পিতা নোঽসি। কেবলই তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্ছেন, এই অনুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অনুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষোহ্যেবানন্দয়াতি। কেই বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত। আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন। এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্ছেন।

২৮ চৈত্র

ভয় ও আনন্দ

ওঁ পিতা নোঽসি এই মন্ত্রে দুটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে। পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছেন।

আর এক দিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো।

এক দিকে অভেদের গৌরব, আর-এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি কিন্তু স্পর্ধা করতে পারি নে। আমার যেখানে সীমা আছে সেখানে মাথা নত করতে হবে।

কিন্তু এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেননা তিনি কেবলমাত্র আমার বড়ো নন তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়ো, আমি তাঁরই ছোটো। তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার বড়ো আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই—জবরদস্তি নেই। যে বড়োর মধ্যে আমি আছি, যে বড়োর মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, কিছু দেব বলে প্রণাম নয়, ভয়ে প্রণাম নয়, জোরে প্রণাম নয়। আমারই অনন্ত গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহত্ব অনুভব করেই প্রার্থনা করা হয়েছে, নমস্তেঽস্তু, তোমাতে আমার নমস্কার সত্য হয়ে উঠুক।

তাঁকে পিতা নোঽসি বলে স্বীকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের একটি পরিমাণ রক্ষা হয়। তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবরসে প্রমত্ত হবার যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আত্মবিস্মৃতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। সম্ভ্রমের দ্বারা আমাদের আনন্দ গাম্ভীর্য লাভ করে, অচঞ্চল গৌরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমস্ত মানব-সম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। মাতার সম্বন্ধকেও সেখানে তাঁরা স্থান দেন নি।

কারণ, মাতার সম্বন্ধেও একদিকে যেন ওজন কম আছে, একদিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের সুখ দেখেন, আরাম দেখেন; তার ক্ষুধাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সান্ত্বনা দেন, তার রোগে শুশ্রূষা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাবনিবৃত্তির প্রতিই লক্ষ্য করে।

পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এইজন্যই সন্তানের আরাম ও সুখই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এইজন্য তিনি সন্তানকে দুঃখও দেন। তাকে শাসন করেন, তাকে বঞ্চিত করেন, যাতে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত না হয় সেদিকে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে কিন্তু সে-স্নেহ সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয় বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা যায় না এবং তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেইজন্যে পিতাকে নমস্কার করবার সময় বলা হয়েছে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ; যিনি সুখকর তাঁকে নমস্কার যিনি কল্যাণকর তাঁকে নমস্কার।

পিতা কেবল আমাদের সুখের আয়োজন করেন না, তিনি মঙ্গলের বিধান করেন।

সেইজন্তেই সুখেও তাঁকে নমস্কার, দুঃখেও তাঁকে নমস্কার। ওইখানেই পিতার পূর্ণতা; তিনি দুঃখ দেন।

উপনিষৎ একদিকে বলেছেন, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হতেই যা কিছু সমস্ত জন্মেছে। আবার আর-একদিকে বলেছেন, ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ইহার ভয়ে অগ্নি জ্বলছে, ইহার ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়, তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে। অনন্ত দেশে অনন্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই অমোঘ নিয়মই হচ্ছে ভয়। তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী খাটে না, সে কোথাও কাউকে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। এই যা কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে—সেই যে প্রাণ, যাঁর থেকে সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে সমস্তই চলছে তিনি কী রকম? না, তিনি উদ্যত বজ্রের মতো মহা ভয়ংকর। সেইজন্তেই তো সমস্ত চলছে—নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মতো অতি নিদারুণ হয়ে উঠত। আমাদের পিতা যে ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। এই ভয়ের দ্বারাই অনাদি কাল থেকে সর্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে, সর্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদেরও যেদিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে, কী ব্যবহারে সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন—মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। সেদিকে কোনো ব্যত্যয় নেই কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমরা যখন বলি, পিতা নোঽসি, তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মত্ততার প্রশ্রয় নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংবৃত বিনম্র নমস্কার আছে। যে বলে পিতা নোঽসি, সে তাঁর সামনে "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ" হয়ে থাকে। সে নিজেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধৈর্য ক্ষুদ্র আত্মবিস্মৃতি থেকে রক্ষা করে চলতে থাকে।

২৯ চৈত্র

নিয়ম ও মুক্তি

সুখ জিনিসটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি—যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব, যা ভালো তাই আমাদের দাও, তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ সেই ভালোই আমার পক্ষেও সত্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। যা বিশ্বের ভালো, তাই আমার ভালো কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখসুবিধা কিছুই খাটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব-স্তুতি অনুনয়-বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে তখনই সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

এখনও নিয়মের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় নি। এখনও চলতে ফিরতে বাধে। এখনও সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অনুভব করি নে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এইজন্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্ছে না—পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অনুভব করছি তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্ছে না।

অর্থাৎ মঙ্গল এখনও আমার পক্ষে ধর্ম হয়ে ওঠে নি। যার ধর্ম যেটা, সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয় সেইটেই তাঁর আনন্দ। চোখের ধর্ম দেখা, তাই দেখাতেই চোখের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট। মনের ধর্ম মনন করা, মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার দুঃখ।

বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তখন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।

মায়ের ধর্ম যেমন পুত্রস্নেহ ঈশ্বরের ধর্মই তেমনি মঙ্গল। সমস্ত জগৎচরাচরের ভালো করাই তাঁর স্বভাব, তাতেই তাঁর আনন্দ।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে, সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম। এই ধর্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণপরিণত হয়ে ওঠবার জন্যে নিয়তই মনুষ্যসমাজে প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা দুঃখ পাচ্ছি, পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠছে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনই তার মুক্তি হয়, যখন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ, ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মতো ব্যবহার করবে।

তার কারণ কী? তার কারণ এই, যে পর্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনই পিতাপুত্রের মাঝখানের আনন্দ-সম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে। তখনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতাদ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তখন প্রিয়-অপ্রিয়ের দ্বন্দ্ববর্জিত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়, মঙ্গল তখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বিধাবর্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়। তখনই আমাদের মুক্তি। সে মুক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয়; বন্ধন শূন্য হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে, কর্ম চলে যায় না কিন্তু কর্মই আসক্তিশূন্য বিরামস্বরূপ ধারণ করে।

৩০ চৈত্র

দশের ইচ্ছা

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিতা নোঽসি বলতে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এই আকাঙ্ক্ষাটিকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখা বড়ো কঠিন।

অথচ আমাদের মনে কত অত্যাকাঙ্ক্ষা আছে, কত অসাধ্যসাধনের সংকল্প আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরস্ত হতে চায় না। বাইরে থেকে যদি বা খাদ্য জোগাতে নাও পারি তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে-আকাঙ্ক্ষা সকলের চেয়ে বড়ো, যা সকলের চেয়ে চরমের দিকে যায়, তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাখা এত শক্ত কেন?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি আকাঙ্ক্ষা জিনিসটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী—আমিই ইচ্ছা করছি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোটো ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একান্ত নিজের ইচ্ছা? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেখে না টাকা জিনিসটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে ভালো খাবে ভালো পরবে সে-কথা তার মনেও নেই। কারণ বস্তুতই টাকার লোভে সে ভালো খাওয়া পরা পরিত্যাগ করেছে। টাকার দ্বারা সে অন্য কোনো সুখকে চাচ্ছে না, অন্য সব সুখকে অবজ্ঞা করছে, সে টাকাকেই চাচ্ছে।

এমনতরো একটা অহেতুক চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়ারি ছেলের মনে প্রচণ্ড হয়ে আছে তার কারণ, এই ইচ্ছা তার একলার নয়, সকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাচ্ছে, কোনোমতেই তার ইচ্ছাকে থামতে দিচ্ছে না।

কোনো সমাজে যদি কোনো একটা নিরর্থক আচরণের বিশেষ গৌরব থাকে তবে অনেক লোককেই দেখা যাবে সেই আচারের জন্য তারা নিজের সুখসুবিধা পরিত্যাগ করে তাতেই নিযুক্ত আছে। দশজনে এইটে আকাঙ্ক্ষা করে এই হচ্ছে ওর জোর, আর কোনো তাৎপর্য নেই।

যে-দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড়ো জিনিস বলে জানে সে-দেশে বালকেও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। অন্য দেশে এই দেশানুরাগের উপযোগিতা উপকারিতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা হ'ক না তবু দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ দশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিচ্ছে না, পালন করছে না।

বিশ্বপিতার সঙ্গে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্তী হওয়ার চেয়েও এটা বড়ো ইচ্ছা। কিন্তু এতবড়ো ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাগিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে এই জন্যেই। আমার চারিদিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করছে না। এর চেয়ে ঢের যৎসামান্য, এমন কি, ঢের অর্থহীন ইচ্ছাকেও তারা আমার মনে সত্য করে তুলেছে এবং তাকে কোনোমতে নিবে যেতে দিচ্ছে না।

এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই সার্থক করে রাখতে হবে। দশ জনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নয়, শত সহস্র ক্ষুদ্র অর্থকে কৃত্রিম অর্থকে সংসারের লোক রাত্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড়ো করে সত্য করে রেখেছে। সেই ইচ্ছাগুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্কারগত করে রেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টানছে, আমার চেষ্টাকে কাড়ছে। বুদ্ধিতে যদি বা বুঝি তারা তুচ্ছ এবং নিরর্থক কিন্তু দশের ইচ্ছাকে ঠেলতে পারি নে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় কিন্তু সে যখন আমারই ইচ্ছা আকার ধরে আমারই চূড়ার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যখন জানতেও পারি নে যে বাইরে থেকে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তখন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এত বড়ো একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকূলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্তু আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথি করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই এক দিনে শেষ হবে না কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মস্ত সুবিধা যে, এর মধ্যে কোনোমতেই ফাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশ জনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কোনো কৃত্রিমতাকে ঘটিয়ে তোলবার আশঙ্কা নেই। নিতান্ত খাঁটি হয়ে চলতে হবে।

টাকা, বিদ্যা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই যে সেগুলোকে নিয়ে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে। অতএব আমি যদি তার কিছু পাই তবে অন্যের চেয়ে আমার জিত হয়। এইজন্যেই সমস্ত উপার্জনের মধ্যে এত ঈর্ষা ক্রোধ লোভ রয়েছে। এই জন্যে লোকে এত ফাঁকি চালায়। যার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেষ্টা করে তার অর্থ বেশি, যার বিদ্যা অল্প সে সেটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টায় ফেরে।

এইসকল জিনিসের দ্বারা মানুষ মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, সুতরাং জিনিসে যদি কম পড়ে তবে ফাঁকিতে সেটা পূরণ করবার ইচ্ছা হয়। মানুষকে ঠকানোও একেবারে অসাধ্য নয়, এইজন্যে সংসারে অনেক প্রতারণা অনেক আড়ম্বর চলে, এইজন্যে ভিতরে যদি বা কিছু জমাতে পারি বাইরে তার সাজসরঞ্জাম করি অনেক বেশি।

যে-সব সামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেইগুলির সম্বন্ধে এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিজের অগোচরেও এসে পড়ে। ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টাকে আমরা দোষের মনে করি নে। এমন কি, বাহিরের সাজের দ্বারা আমরা ভিতরের জিনিসকে পেলুম বলে নিজেকেও ভোলাই।

কিন্তু যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা চালাতে পারে কিন্তু নিজের দুধে জল মিশিয়ে তার মুনফা কী হবে।

অতএব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। যিনি সত্যস্বরূপ তাঁকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। যিনি অন্তর্যামী তাঁর কাছে জাল-জালিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই জানবেন—মানুষকে যদি জানাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোনো দিন জালদলিল বানিয়ে তাঁকে সুদ্ধ মানুষের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে। ওইখানে দশকে আসতে দিয়ো না, নিজেকে খুব করে বাঁচাও। তুমি যে তাঁকে চাও এই আকাঙ্ক্ষাটির দ্বারা তুমি তাঁকেই লাভ করতে চেষ্টা করো, এর দ্বারা মানুষকে ভোলাবার ইচ্ছা যেন তোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনায় সবাই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে তাতে তোমার মঙ্গলই হবে, কারণ, ঈশ্বরের আসনে সবাইকে বসাবার প্রলোভন তোমার কেটে যাবে। ঈশ্বরকে যদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সে একটি কঠিন সময়। দশের মধ্যে এসে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সামলানো শক্ত হয়, মানুষ তখন মানুষকে চকস করে, তখন খাঁটি ভগবানকে

চালাতে পারি নে, লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে থাকি। ক্রমে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে সত্যের বিকারে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। অতএব পিতাকে যেদিন পিতা বলতে পারব সেদিন পিতাই যেন সে-কথা আমার মুখ থেকে শোনেন, মানুষ যদি শুনতে পায় তো যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

৩১ চৈত্র

বর্ষশেষ

যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই দুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।

আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ওই আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই দুটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।

সেইজন্যে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অস্তাচলকে সম্মুখে রেখে আজ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা। যং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—সমস্ত যাওয়াই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, দিবসের শেষ মুহূর্তে যাঁর পায়ের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে নত হয়ে পড়ছে, আজ সায়াহ্নে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জানব—তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব, যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ।

মৃত্যু বড়ো সুন্দর বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন ; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে ; তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে ; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণস্থিতিকে বিচলিত করে।

আসক্তির মতো নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই ; সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে

না, সে কারও জন্যে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম; সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করছে।

ত্যাগ বড়ো সুন্দর, বড়ো কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য। মৃত্যুই পরিবেষণ করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড়ো হয়ে উঠতে চায় তাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসারের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষমা করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা কিছুতে নরম হত না। সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই। এই বিষাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে আর্দ্র করেছে। এই বিদায়ের সুরটি যখন কানে এসে পৌঁছোয় তখন ক্ষমা খুবই সহজ হয়ে যায়, তখন বৈরাগ্য নিঃশব্দে এসে আমাদের নেবার জেদটাকে দেবার দিকে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে যখন জানি তখন পাপকে দুঃখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানি নে। দুর্গতি একটা ভয়ংকর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম সে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমস্তই সরছে এবং সেও সরছে সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগোচ্ছে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাই নে কিন্তু সে চলছে। ওইখানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ যদি স্থির হয়েই থাকত তাহলে সেই স্থিরত্বের উপর রুদ্রের অসীম শাসনদণ্ড ভয়ানক ভার হয়ে তাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিত। কিন্তু বিধাতার দণ্ড তো তাকে এক জায়গায় চেপে রাখছে না, সেই দণ্ড তাকে তাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই চালানোই তাঁর ক্ষমা। তাঁর মৃত্যু কেবলই মার্জনা করছে, কেবলই ক্ষমার অভিমুখে বহন করছে।

আজ বর্ষশেষ আমাদের জীবনকে কি তাঁর সেই ক্ষমার দ্বারে এনে উপনীত করবে না? যার উপরে মরণের শিলমোহর দেওয়া আছে, যা যাবার জিনিস তাকে কি আজও আমরা যেতে দেব না। বছর ভরে যেসব পাপের আবর্জনা সঞ্চয় করেছি, আজ বৎসরকে বিদায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিদায় দিতে পারব না? ক্ষমা করে ক্ষমা নিয়ে নির্মল হয়ে নব বৎসরে প্রবেশ করতে পাব না?

আজ আমার মুষ্টি শিথিল হ'ক। কেবল কাড়ব এবং কেবল রাখব এই করে কোনো সুখ কোনো সার্থকতা পাই নি। যিনি সমস্ত গ্রহণ করেন আজ তাঁর সম্মুখে এসে,

ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক। আজ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়তে সম্পূর্ণ মরতে এক মুহূর্তে পারব না; তবু ওই দিকেই মন নত হ'ক, নিজেকে দেবার দিকেই তার অঙ্গুলি প্রসারিত করুক, সুধাস্তের সুরেই বাঁশি বাজতে থাক্‌, মৃত্যুর মোহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক। নববর্ষের ভারগ্রহণের পূর্বে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই সর্বভার মোচনের সমুদ্রতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি, নিস্তরঙ্গ নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই, বৎসরের অবসানকে অন্তরের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে শুদ্ধ হই শান্ত হই পবিত্র হই।

৩১ চৈত্র

অনন্তের ইচ্ছা

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করছে। সে ব্যাধির সময় কত রকম প্রতিকারের আশ্চর্য ব্যবস্থা করছে তা আমরা জানিই নে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্য-স্থাপনার জন্যে তার কৌশলের অন্ত নেই, তারও কোনো খবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার অগোচরে রাত্রিদিন নিদ্রায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করছে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এইটিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অনুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যখন খাব বলে আবদার করছে তখন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচজনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ সুবিধা সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্ছে, সকলেই জিততে চাচ্ছে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই

সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি কত যুদ্ধ কত দলাদলি চলছে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে। তাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে আছেই না থাকলে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না, সে হচ্ছে মঙ্গলের ইচ্ছা। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের সুখ হ'ক ভালো হ'ক এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবেই আছে। এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমুদয় সুখ সুবিধা স্বাধীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এই নিগূঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড়ো বলে অনুভব করতে চায়। সে ধনে বড়ো বিদ্যায় বড়ো খ্যাতিতে বড়ো হয়ে নিজেকে বড়ো জানতে চায়। এর জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই।

কিন্তু তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইছে। সকলের বড়ো, যিনি অনন্ত অখণ্ড এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগূঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ইচ্ছাকে সেই নিগূঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যলাভ করেছে একটি একের মধ্যে সেইটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে। শরীরের যে ভবিষ্যৎটি এখন নেই সেই ভবিষ্যৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে; সে ওই মঙ্গলইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্তমান সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে-সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেইসকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়, অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্মকে কেবলই আকর্ষণ করছে; সে যেখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে সেখানে গিয়ে থামতে পারছে না। কেবলই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল এবং আত্মার মধ্যে অদ্বিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করছে। এই ইচ্ছা অনন্তের ইচ্ছা, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সংগত করে দেওয়াই আমাদের মুক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জস্যই আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ। ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদের দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা, কোনো বর্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা সুখের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়। সে-ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম এইজন্যে সে তাঁরই দিকে আমাদের টানছে। এই অনন্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কী শরীরে, কী সমাজে, কী আত্মায়, সর্বত্রই আমরা এই যে দুটি ইচ্ছার ধারাকে দেখতে পাচ্ছি, একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্তনশীল, আর-একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরন্তন; একটি কেবল বর্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী; একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর একটি নিখিলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই দুটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ করো, এর তাৎপর্য গ্রহণ করো। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছে সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্যই সমস্ত জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত করো।

৩ বৈশাখ

পাওয়া ও না-পাওয়া

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে-সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না—অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে—সেইজন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে-সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেট ভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে-সুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু যে-সৌন্দর্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেলতে পারি নে—যা বীণার অনুরণনের মতো চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে-আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করি নে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাকেই বলি যে-পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। যে-জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর, তার মূল্য অতি অল্প কেননা, সেটা একটা সংকীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না, যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে, যা কেবল ঘটনা-বিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিরাজমান, সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি, আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয়, কোনো এক সময়ের আলাপে আমোদে কোনো এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাই নে। তার সঙ্গে যে-সময়ে যে-আলাপে যে-কর্মে নিযুক্ত আছি, সে-সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্মকে বহুদূরে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারি নে, সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত, এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয় সে না পেতেও চায়। এইজন্যেই সংসারের সমস্ত দৃষ্টস্পৃষ্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চির-দিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।

> যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
> আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ভুয়ে ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্, যিনি বলেন আমি তাঁকে জানি নি তিনিই জানেন, যিনি বলেন আমি জেনেছি তিনি জানেন না।

আমি তাঁকে জানতে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই, পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ, এইজন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ, ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেন, নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ, আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানি নে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, যেমন করে এই সমস্ত জিনিসপত্র জানি ; নইলে আমার কিছুই হল না।

আমি বলছি আমরা তা চাই নে। যদি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিসপত্রের অন্ত কোথায় ? এর উপরে আবার কেন ? নীড়ের পাখি যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। একজন বললে, ওই যে, ওই আলোতে টিকা ধরাব। বলে টিকা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তখন আর একজন বললে, দূর চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে। বলে সে আরও কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল—টিকা ধরল না।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্ছে এই যে, যে-ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা এই রকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজনসিদ্ধিই চাই—টিকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ওই চাঁদের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। আমরা

দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাই নে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীর্ণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো চাওয়া। সেইজন্তেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠলেই নদীতে নৌকায় ঘাটে গ্রামে পথে নগরের হর্ম্যতলে গাছের নীচে চারিদিক থেকে গান জেগে ওঠে, কারও টিকের আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম তো তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার, আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উলটো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। যে-জিনিস আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহংকারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিস আমার ভৃত্য আমার অধীন, আমি তার চেয়ে বড়ো।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই, এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেয়ে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে বয়ে যায় নি, সে যেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্তমানকেই চাচ্ছে। কিন্তু সে তো কেবলই বর্তমান নয়, সে তো কেবলই হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে, খাদ্য দিচ্ছে। এই জন্তেই মানুষ কেবলই বলে, অনেক দেখলুম অনেক শুনলুম অনেক বুঝলুম, কিন্তু আমার না-দেখার ধন না-শোনার ধন না-বোঝার ধন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না, যাকে পাই নে বলেই হারাই নে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্তেই আত্মা কাঁদছে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ংকর নির্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

৪ বৈশাখ

হওয়া

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ওইসকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমান্তে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এইরকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ওইরকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ, তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা-কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নন।

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া, সে তো লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বলবে, বল কী। তুমি ব্রহ্ম হবে। এমন কথা তুমি মুখে আন কী করে!

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ-কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এতবড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাত নেই? মস্ত তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি, আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা,

সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত খেত কত শহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এই সমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ওই বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহ্বরে লুকিয়ে রাখতে পারে না, যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মতো বলে, হাঁ সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি তাকে উত্তর দেব, ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর কিছুই হতে পারি নে। আর কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না, এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার, স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতিমুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকালবেলায় এইখানে বসে যে একটুখানি উপাসনা করি এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন জমছে না বলে খুঁত খুঁত ক'রো না। এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা ক'রো না। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উলটোদিকে নয়,

নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

৬ বৈশাখ

মুক্তি

এই যে সকালবেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্পই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিসকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ এইজন্যে সে সমস্ত জিনিসকেই বদ্ধ করে দেয়।

আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই তখন কোনো নূতন পৃথিবীকে দেখতে যাই নে। এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখতে যাই। আবরণটাকে ঘুচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেললেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই সেই অভাবনীয়কে দেখতে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তখনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্যই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনন্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্যেই তাকে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষৎ—আনন্দরূপমমৃতং—ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফুরিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই—যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অমৃতকে দেখি সেইখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসীমই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্যে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছি নে।

বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, কবি বল, তাঁদের কাজই মানুষের এই সমস্ত মূঢ়তা ও

অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্তরূপকে দেখানো, যা-কিছু দেখছি একেই সত্য করে দেখানো, নূতন কিছু তৈরি করা নয় কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্ছে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন ঘর ছেড়ে গিয়ে কোনো দূরদেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াই বলে অন্ধকার-মোচন, তেমনি জগৎসংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়; পাপ স্বার্থ অহংকার জড়তা মূঢ়তা ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যা করছি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্তস্বরূপেই আনন্দিত তাহলে তাঁর সেই অব্যক্তস্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে তো হতেই পারে না। তাই উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্যে অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ, তবে আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুর দ্বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম করছেন তেমনি আনন্দেই কর্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায় তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে, আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয় সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয় যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি।

৭ বৈশাখ

মুক্তির পথ

যে-ভাষা জানি নে সেই ভাষার কাব্য যদি শোনা যায় তবে শব্দগুলো কেবলই আমার কানে ঠেকতে থাকে, সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তখন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে, তখন তাকে কাব্য বলে বুঝতে পারি ভোগ করতে পারি।

বালক যখন কোনো দুর্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মুক্তি প্রার্থনা করে তখন কাব্যপাঠ বন্ধ করে তাকে যে মুক্তি দেওয়া যায় সে মুক্তির মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তুলে পূর্ণ করে তুলে তাকে যে মূঢ়তার পীড়া হতে মুক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি, চিরন্তন মুক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওয়াতেই যদি আমরা দুঃখ পাই, তাকে আমরা ভবযন্ত্রণা বলি। জগৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়, তবে বিশ্বকবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমূলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বলব।

কিন্তু এই কাব্যখানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

সমুদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করার চেয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হওয়া ঢের বেশি সহজ। এ পর্যন্ত কোনো দেশের মানুষ সমুদ্র সেঁচে ফেলবার চেষ্টা করে নি, তারা সাধ্যমতো নৌকো জাহাজ বানিয়েছে।

বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।

এই বিশ্বপ্রকাশের রূপের মধ্যে যখন আনন্দকে দেখব কেবলই রূপকে দেখব না, তখন রূপ আমাকে আর বাধা দেবে না। সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে তা নয় আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল তার পীড়াকরতা ত্যাগ করে তা নয় ভাষা তখন নিজের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করে আনন্দময় হয়ে ওঠে, ভাবে ভাষায় অন্তরে বাহিরে মিলন তখন আমাদের মুগ্ধ করে। তখন সেই ভাষার উপরে যদি কেউ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই যে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এটা নিজের ভিতর থেকেই বুঝতে হয়। যে ভাষা জানি নে কেবলমাত্র বাইরে থেকে বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কোনো কালেই তাকে পাওয়া যায় না। চোখ কান সেখান থেকে প্রতিহতই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জ্ঞানের শক্তিতেই তাকে বুঝতে হয়। যখন একবার ভিতর বুঝি তখন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আসে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের ঊর্ধ্ব দিয়ে কত মেঘ চলে যায়—শুষ্ক হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। যেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিশ্বের চিরানন্দপ্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারি নে।

আমার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই, তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি সে বিশ্বেও সর্বত্র মূঢ়তা দেখে, বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে আনন্দ না থাকে তবে

বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা, প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি। কোনো ব্যায়ামের দ্বারা কোনো কৌশলের দ্বারা মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গলসাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞানসম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে অতিক্রম করে সে অনন্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তখনই প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। একেই তো বলে মুক্তি।

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা দয়ার সাধনা প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্যমাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতর করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে, পাপপরিশূন্য মঙ্গলসাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে থাকবে ততই বিশ্বসংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিন্তায় ভাবে কর্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিক্‌ থেকেই জগৎকে দেখব—নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, মহাকবির চিরন্তন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠবে।

৭ বৈশাখ

৯

আশ্রম

শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে

প্রভাতের সূর্য যে উৎসবদিনটির পল্লবদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে, সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছোয় নি? এই বিশ্ব-উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আজও এখনও জাগল না? কোনো বাতাসে এখনও সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে, দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই। কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না, আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা করো, আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে, সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কী নিয়ে, কিসের জন্যে? না, যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধরছে, সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ, সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না, সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি তবে দেখতে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রমবনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফলছে এবং আমাদের আগামীকালের উত্তর-বংশীয়দের জন্যে ফলতেই চলবে।

বহুকাল পূর্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর কজন লোকই বা জানত? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘটল এবং আজকেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে নি। সেই একটি দিনের মধ্যেই একে কুলিয়ে উঠল না। সেদিন যার খবর কেউ পায় নি এবং তারপরে বহুকাল পর্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসবফল প্রসব করছে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু চিরপ্রাণ তো তাদের স্পর্শ করে না, তারা ঘটছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কোথাও থাকছে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্তটিকে কখন লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান, তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক, সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক, কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে, নিত্যকালের সূর্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে, সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ংকর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন, তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কীরকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠছে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই, যে-প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম এধি—হে

প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তাঁর সেই প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি তো আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর আর পর্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই। তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখে নি তারা অহংকেই বড়ো করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহংকার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে-লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহং-এর দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহং-এর আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে-প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই তো নিজের প্রচুর তেল ও সলতের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব করে। আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল সলতের দিকে ফিরে তাকায়? সে ওই আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত সলতে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন

সে কি আর অহংকারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেই জন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখতে পায়। সে তো কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না, কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই জন্যই তার বাক্য ও কর্ম নিত্য হয়ে ওঠে। তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।

তিনি আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে-জায়গায় বড়ো এসে দাঁড়ান সে-জায়গাকে ছোটো বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না। এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে। এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে-কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে-কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না, মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাখব। এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে খর্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং-রূপে বিরাজ করছেন তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি-মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্ছে, অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে। এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড়ো আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করছে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্মল করে দিচ্ছে। সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সংকোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্ছে। তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্ছে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাদের ধৈর্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠছে এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে

অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্ত দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্ছে এবং যে জ্যোতির্ময় পরমানন্দধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তর-ধারায় দিগ্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্তে তারা একটি আহ্বান শুনতে পাচ্ছে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্তময় সৃষ্টির কাজ চলছে সেই রহস্তটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্ছে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলই বিকীর্ণ করছে, কেবলই বলছে তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্ছে না। সেই আনন্দের কাজ আর ফুরোল না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ সেই আনন্দসম্মিলন তো শূন্তার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। এই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলছে, এখানকার গাছপালা শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্ছে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত এখানকার সূর্যোদয়কে, সূর্যাস্তকে এবং নিশিথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলছে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্ত আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে এই ছায়াশূন্ত বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন, সেই দিনটি আর মরল না। সেই দিনটি বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে চিরদিনের মতো আটকা পড়ে গেল। শূন্ত প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল। যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এই যে আশ্চর্য রহস্ত, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে

চায় না তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা এই খানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্তনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে। যেই—এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ, যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে —হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে-দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুলবে না? না, তা কখনোই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফিরবে, পাষাণহৃদয়ও গলবে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেইখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে। সে-শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে-শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না। তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানি নে। তোমার সূর্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করছে যদি গণনা করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানি নে।

তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করছে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সামনে নানা রঙের ছবি আঁকছে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করছে, যা বলছে "আমি জল," ব'লে আমাদের স্নান করাচ্ছে, যা বলছে "আমি স্থল," ব'লে আমাদের কোলে করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জানতে পারি—তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি। তখন তোমার যে-শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে গভীরে গোপনে। কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখতুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে তো কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি তো অচেতনভাবে হবে না, সেটি তো মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয়, এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সবচেয়ে বঞ্চিত হয়। যে-সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ

জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্মল করব, আমরা আজ যথার্থভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে-সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।

৭ পৌষ, প্রাতঃকাল, ১৩১৬

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে-পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত এ ছাড়া অন্য রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চারদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সার পদার্থসকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় শহর সৃষ্টি করে বসে, তখন সেটা

সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হ'ক, অনেকে একত্র হবার একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি। এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে-জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অন্নস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে। এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোকে আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে, ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, এই যা কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইটকাঠলোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশসমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীনযুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন। রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলোয় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য সাম্রাজ্য নগরনগরী স্থাপিত হয়েছে, দেশ-বিদেশের সঙ্গে তার পণ্য আদানপ্রদান চলেছে, অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে, এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় যা কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি কিন্তু নানাবিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। তখন, চীন, হূন, শক, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে। তখন জনকের মতো রাজা একদিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনও কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, তা তাঁর তপোবন-চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনই উদ্‌ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশসমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো; তারা নীবার ধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটিরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং

আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন। পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে, এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার ধান্ত কুটিরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত, এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধ ধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ওই, চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটিরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে; বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ড আহার করছে; নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে; হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই না কি প্রধানত নাটকের উপাদান এই জন্যেই অন্যদেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই

একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতল-স্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্য-নিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্ত একটা বাহার মাত্র, এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচাবয়সের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছোয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্র-মুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত; আপক্কশালি-রুচিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরব-নূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে মন্দ্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না, সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের দুই একটি খণ্ডকাব্য আছে নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সেইসকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত, তার চারদিকে আর কিছুরই স্থান নেই; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীত-গন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সেসকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাচের ভিতর দিয়ে একটি

বিন্দুমাত্রে সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জলে ওঠে, কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্ত-প্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি। যে-পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয় সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারংবার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এই রকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্য-বিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা

বদ্ধ আছে। ভারতবর্ষের যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূরকালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে-রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন—সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়-সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত—আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে-রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে-ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্ম-ঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদ-ভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনায় উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু যে-অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকটবর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসংবৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গল-জটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয়-বার্তায় জগৎকে উদ্বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধতেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশ-জ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী, আর হয়েছে কী। সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের, কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার—এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে-ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর

গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে-তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এই জন্যেই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়-সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে, অন্যদেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এই জন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য-দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তাহলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে-মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জল স্থল আকাশ তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর

একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদী তৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন; এই তপোবনটি দুষ্মন্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষ-পর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যান-মগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে,—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃত-লোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে যেমন হয়ে থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন হওয়া ভালো। এই "যেমন-হওয়া-ভালো"র দিকে "যেমন-হয়ে-থাকে" চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। "যেমন-হয়ে-থাকে" হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর "যেমন-হওয়া-ভালো" হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও "যেমন-হয়ে-থাকে" তপস্যার দ্বারা অবশেষে "যেমন-হওয়া-ভালো"র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানসলোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছোয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ, অতএব কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর

পর্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁরা ক্লেশবোধ করেন নি। এই সমস্ত নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল। এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারংবার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেন নি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

> একৈকং পাদপংগুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
> অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
> রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
> সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
> বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্।
> রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে সকল তরুগুল্ম কিংবা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ—গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণ্যং সর্বভূতানাম্। ইহা ব্রাহ্মীলক্ষ্মী দ্বারা সমাবৃত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারিদিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল—কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকের মৃগ পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়—সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল—সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের As you like it নাটক একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেস্টও তাই, Midsummer night's dream ও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত—অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাই নে।

অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি। হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে; হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে নানালীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে "Beast, bird, insect or worm durst enter none; such was their awe of man."—অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্য ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে-মিলন মূঢ়তার মিলন নয় সে-মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জলস্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর

গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন, যত্র ক্রমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে। তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণগলার মতো গলে যাচ্ছে।

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহ-দুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগনদী-অরণ্যনগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এই জন্যই প্রভু-শাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ী-হৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে। এক, ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই, এখানে চাষও চলে না বাসও চলে না, এখানে পণ্য-সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অন্তত সেই সমস্তই এখানে মুখ্য নয়। এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি ক'রে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে, এইজন্যেই তা পুণ্যস্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদী-গুলি লোকালয়সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্য-সলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে,

যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্য-নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তি-বৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। । জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি, তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি; এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন কি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে, এতে মানুষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে নির্বাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্‌গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে এ-বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ-বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে-ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে-লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই

স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এই জন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে। যে-লোক চেতনভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ-কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে সে-লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয় তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না; কারণ, এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা, তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে-ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে এ-কথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্য মাংস আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে—পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরের পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণিহত্যা করাই আমোদের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না।

ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল—সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই জন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে-সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ,
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃপরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়, কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে; প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা। বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যেসকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়।

যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা; প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয় আমাদের কামনা আছে বলেই; লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয় আমাদের লোভ আছে বলেই।

এই জন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞান-বিহীনের দুরাশামাত্র। কিন্তু সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেই জন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি। তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এই রকম তপস্যার স্থান। এই রকম বিদ্যালয় যে অনেক-গুলি হবে আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের

বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানাদিক্‌কে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শরীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয়দল ঠিক তেমনি করেই নূতন আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ডসকলকে অনুবর্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনও যেমন হয়েছিল এখনও তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছোয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল, যা বর্বরের

আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়। ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠে নি। মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগর-নগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এই নগর-স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালেপালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে-শাখাটি যেদিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা অভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ-কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে-জিনিসের অভাব নেই

তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তাহলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান-বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে; দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধক-ভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদরূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য,

শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এই জন্যেই ঝড় চিরদিন টি্ঁকতে পারে না, এই জন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এই জন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

ছুটির পর

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর নিই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়—কর্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্র থেকে যদি এই রকম দূরে না যাই তবে কর্মের যথার্থ তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি নে। অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন মাকড়সার জালের মতো আমাদের চারদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না। এই জন্য অভ্যস্ত কর্মকে পুনরায় নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্মকেই দেখব না। কর্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার-কারখানার মুটে-মজুরের মতোই সর্বাঙ্গে কালিঝুল মেখে দিন কাটিয়ে দেব না। একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলই কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেরই শামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্মক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছি। এবার কি আবার নূতন দৃষ্টিতে কর্মকে দেখছি না? এই কর্মের মর্মগত সত্যটি অভ্যাসবশত আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্ছে না?

এ আনন্দ কিসের জন্যে? এ কি সফলতার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি? এ কি আমাদের আত্মকীর্তির গর্বানুভবের আনন্দ?

তা নয়। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ কর্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্মের চেয়ে বহুগুণে বড়ো জিনিসটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহংকার দূর হয়ে যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে, তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের আনন্দময় প্রভুকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফালনকে দেখি না।

এখনকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র। কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খেটে মরা এবং খাটিয়ে মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম? তা নয়।

এই চেষ্টাকে বড়ো করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড়ো ফল বলে গর্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গল কর্মের উপরে সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গল কর্ম সেই বিশ্বকর্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না। নিরুদ্যম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন। এই জন্যই কর্ম, নইলে কর্মের মধ্যেই কর্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্মাকেই লাভ করবার একটি সাধনা তাহলে কর্মের মধ্যে যা কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতি-কূলতাকে দেখলে কর্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে; কারণ, কর্মফলের

চেয়ে আরও যে বড়ো ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করলে আমরা কৃত-কার্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না, বস্তুত কৃতকার্য হব কি না তা জানি নে, কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়, তাতে আমাদের তেজ ভস্মমুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও যে, কর্মে বাধা আছে। আনন্দিত হও যে, কর্ম করতে গেলেই তোমাকে নানাদিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করছ বারংবার তার পরাভব ঘটবে। আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে ও অপমানিত করবে। আনন্দিত হও যে, তুমি যে-বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিলে বারংবার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই তো সাধনা। যে-ব্যক্তি আগুন জ্বালতে চায়, সে-ব্যক্তির কাঠ পুড়ছে বলে দুঃখ করলে চলবে কেন? যে-কৃপণ শুধু শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও! তাই ছুটির পরে কর্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেখে? যিনি কর্মের উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে।

তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টার চেষ্টারূপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমূর্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে, ভরা জোয়ারের জলের মতো সমস্ত থমথম করতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে—যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী! তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তার ভয়ংকর উদ্যম কী পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কী কমনীয় হাসিই হাসছে! আমরাও আমাদের কর্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দররূপ দেখে উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব। কর্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে আচ্ছন্ন করে দেব। আমাদের কর্ম—মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিলে মধুময় হয়ে উঠবে।

বর্তমান যুগ

আমি পূর্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলেছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড়ো কাল, এর অভ্যন্তরে কী প্রচ্ছন্ন আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্বমানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য মানবমাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে শুষ্ক পত্র ঝেড়ে ফেলে নব পল্লবে সেজে ওঠে, মানবপ্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছে একে এখন কোনোমতেই বাইরের শক্তি দ্বারা চেপে ছোটো করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিসটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখছি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্স (Politics) বলি। তাকে যত বড়ো করেই দেখি না কেন, সে নিতান্তই বাহিরের জিনিস। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করছে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করছে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না; পলিটিক্সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন, এই তো বিংশ শতাব্দীর বার্তা। বিশ্বাস করো, অনুভব করো, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন? তন্দ্রা কি ছুটবে না? আকাশ হতে যখন বর্ষণ হয়, ছোটো বড়ো যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার পূর্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তা কল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সার্থকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। তোমরা আশ্রমবাসী

এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোলো। প্রস্তরের উপর দিয়ে জলস্রোত যেমন করে বহে যায়, সেখানে দাঁড়াবার কোনোই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়! ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর যেখানে যে-কোনো ছোটো বড়ো সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হ'ক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মেতে হিংসা দ্বেষের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে ফুটবল খেলে এতবড়ো একটা জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে? কখনোই না—এ হতে পারে না। এই যুগের ধর্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্যার দ্বারা সুন্দর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠো। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হ'ক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলা ধুলা পড়া শুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জনা নেই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি, তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভালো করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখো। বর্তমান কালের একটি সুবিধা এই, বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তা অনুভব করছে। পূর্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অন্য স্থানের লোকেরা তার কোনোই খবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছোবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোনো স্থানে ঘা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না, সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই; সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্যাতন তাকে অনায়াসেই সহ্য করতে পারি; নানাদিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা এসে জোর দেয়—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি-না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রম-বাসের সুযোগকে হারিও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরে ফল ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ ঝরা-বউলের, তারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বৃক্ষগুলি যখন ধীরে ধীরে আলোর দিকে মাথা তুলে ধরছিল, তখনও নূতন যুগের কোনোই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌঁছোয় নি। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তখনও বিশ্বমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নি, শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর জন্য বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে এক বিপুল আয়োজন করছিলেন, তার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল—আমাদের কী পরম সৌভাগ্য। আজ বিশ্বদেবতাকে দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে কিছুতেই চলবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, দু দিনের নয়—শতাব্দী-ব্যাপী উৎসব। এই উৎসব কোনো বিশেষ স্থানের নয় কোনো বিশেষ জাতির নয়। এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এস আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোনো রাজার যখন আগমন হয় তাঁকে দেখবার জন্য যখন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। নত করো উদ্ধত মস্তক। দূর করো সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা। মনকে শুভ্র করে তোলো। শান্ত হও, পবিত্র হও। তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফেরো। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন—মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

১০

ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই যে শান্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠছে এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কী চেয়েছিল এবং কী পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড়ো বড়ো রাজা তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা ক্ষোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়। এমন অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর, এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি!

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে-সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিস তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে যে ফলটি ধরে, সে এই সমস্ত জিনিস থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্যান্য সমস্ত কর্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্যে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চারিদিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয় নি। এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্তি ধরে আপনাআপনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুধাগন্ধ, এমন একটি মধুসঞ্চয়। এই জন্যেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ যেমন সহজ যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারিদিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণগন্ধ ফুল ফল নিজের সমস্ত বিচিত্র

আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং শিবমদ্বৈতম্-এর দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, সেই নিভৃতে সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সংগমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্যাবর্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো দুই ভাই-বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষি-পিতামহেরা এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোঽসি, পিতা নোবোধি, নমস্তেঽস্তু—এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে-ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ প্রচলিত নেই কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই কটি মাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই অত্যন্ত ছোটো অথচ অত্যন্ত বড়ো কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—এত বড়ো প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণ দ্বারাও আজ স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

একদিকে এই পুরাতন আকাশ, পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবনবিকাশের নিত্য নূতনতা, আর-একদিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী, এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এক দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।

যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, বরেণ্যং ভর্গঃ, সেই বরণীয় তেজকে ধ্যানগম্য করে তুলছে।

এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র—কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না। তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারম্ভে কী অসহ্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল সে-কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের? চারদিকে তিনি কোন্ জিনিসটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না? যখন আকাশের আলো তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠেছিল, যখন তাঁর পিতৃগৃহের অতুল ঐশ্বর্যের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গৌরব তাঁর মনকে কোনো-মতেই শান্তি দিচ্ছিল না, তখন তাঁর যে কী প্রয়োজন, কী হলে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অরুচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অন্বেষণ করছিল, কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভুলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা-অর্চনা নিয়েই তো দিন কাটিয়েছেন, তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্মের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল তখন এই অভ্যস্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপৃত করে রাখবার উপকরণ তো তাঁর খুব নিকটেই ছিল।

তাঁর ভক্তিকে যে এইদিকে তিনি কখনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবীমন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভুলতেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে শহরে গাঁদাফুল দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশানঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁর চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই সকল চিরাভ্যস্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁর তৃষ্ণার জল যে এদিকে নেই তা বুঝতে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয় নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাখে কার সাধ্য! যারা নানা ক্রিয়াকর্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চায় তাদের নানা উপায় আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ্য মেলে। কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের তো ওই একটি বই আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে? তাদের সামনে কোনো রঙিন জিনিস সাজিয়ে তাদের কি কোনোমতেই ভুলিয়ে রাখা যায়? নিখিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে।

কিন্তু এই অধ্যাত্মলোকের এই বিশ্বলোকের মন্দিরের পথ তাঁর চারদিকে যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারিদিকে প্রচলিত ছিল, এই নির্বাসনের মধ্যে থেকেই তো তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর আত্মা যে-আশ্রয় চাচ্ছিল, সে আশ্রয় বাইরের খণ্ডতার রাজ্যে সে কোথায় খুঁজে পাবে?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এই

কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্তে? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্তে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে, যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর খোঁজেই না, তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চারিদিকে এইজন্তে মুঠো কখন সে ছেড়ে দেয়, তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে দূরে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের যে-সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেই-গুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সব চেয়ে আপন, তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াময় সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক-একজন মহাপুরুষ জন্মান যাঁরা সেই অনেক দিনকার হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিকের জন্তে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জন্তে চারিদিকের কারও কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জন্তে তাঁদের কান্না কোনোমতেই থামতে চায় না। তাঁরা একমুহূর্তে বুঝতে পারেন আসল জিনিসটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস অথচ কেউ তার কোনো খোঁজ করছে না। জিজ্ঞাসা করলে, হয় হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে, নয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আসছে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজ, তাকে তিনি শক্ত করে তুলতে দেন। যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়, পাছে

খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্যটি আমরা না পাই। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মতো এত সহজ আর কী আছে। তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়ে সহজ, তবু তাঁকে আমরা হারাই, সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, এই যে এইখানেই। আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি, কই কোথায়? এই যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই যে আত্মার আত্মায়। যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়োই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই, এই যিনি অত্যন্তই কাছে আছেন তাঁকেই খুঁজে পাবার জন্যে এক-একজন লোকের এত কান্নার দরকার। এই কান্না মিটিয়ে দেবার জন্যে যখনই তিনি সাড়া দেন তখনই ধরা পড়ে যান। তখনই সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউ বা ধর্মের ক্ষেত্রে কেউ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়। কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে, মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি, অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের অনুগত নয়; সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই

অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ, কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে, এর জন্যে বিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি অন্তরের দিকে অখণ্ডের দিকে অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি, এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে-প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে—সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চারদিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে-পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সেই জন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে

বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব, আর কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্ত দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারিদিকে এত বাধাগ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

এ-কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না। দেশ আপনার চিরদিনের যে-জিনিসটি মনের ভুলে হারিয়ে বসেছিল, তার জন্তে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কী করে! চারদিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবশুক যার সহজ-চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়, সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা। যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়, সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্তে একলা তাঁকে কান্না জাগিয়ে তুলতে হয়, বোধহীনতার জন্তেই চারিদিকের জনসমাজ যে সকল কৃত্রিম জিনিস নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে অসহ ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে-দেশ কাঁদতে ভুলে গেছে, খোঁজবার কথা যার মনেও নেই তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা খোঁজা এই হচ্ছে মহত্ত্বের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্তে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্ত আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্বোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল, স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চারদিকে যে সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল, চৈতন্ত না হলে চৈতন্ত আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে, এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল, যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ, জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্তস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।

তার পর থেকে তিনি নদীপর্বত সমুদ্রপ্রান্তরে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি,—কেননা তিনি যে সর্বত্রই, আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত সুখ, যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস গীতগন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ!

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেন নি। এই প্রকাশের কাজে একদিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায় উৎসর্গকরা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-একদিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী,—এই দুই এখানে মিলিত হয়েছে, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রীমন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত হয়ে গেছে সেইখানেই পুণ্যতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করছি, হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, আজ উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্বদা জাগিয়ে রেখে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠতে পারি। গ্রন্থের মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তিসকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে সুযোগ যে-অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলই যেন তাকে নষ্ট করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিত্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলে, যে-মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে, সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া যে

একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তাহলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তাহলে আমরা দিয়েও যাব—তাহলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিলব, এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে সৃষ্টিকার্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মতো ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাটি চিরদিন ফিরে ফিরে আসবে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে, হে আনন্দময় তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি, হে সুন্দর তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, হে পবিত্র তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে; হে অন্তরের ধন তোমাকে বাহিরে পেয়েছি, হে বাহিরের ঈশ্বর তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি।

হে ভক্তের হৃদয়ানন্দ, আমরা যে তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারি নে তার একটিমাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মতো হতে পারি নি। তুমি আত্মদা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজস্র দান করছ। আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্ষুকতা কিছুতেই ঘোচে না। আমাদের কর্ম, আমাদের ত্যাগ, স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য থেকে উদ্বেল হয়ে উঠছে না। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে না। আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দস্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোতে পারছি নে, আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠছে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতুস্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন, আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই, তোমারই স্বরূপকে মানুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি। দেখি যে তাঁরা কিছু চান না কেবল আপনাকে দান করেন, সে-দান মঙ্গলের উৎস থেকে আপনিই উৎসারিত হয়, আনন্দের নির্ঝর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে, তাঁদের জীবন চারিদিকে মঙ্গললোক সৃষ্টি করতে থাকে, সেই সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই, কেবলই প্রাচুর্য, কেবলই পূর্ণতা। দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত করে তখনও তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনও তাঁরা বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন, হে পরম মঙ্গল পরমানন্দ,

তোমাকে আমরা কাছে পাই; তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিসুধা-সরস তোমার অতি মধুর লাবণ্য যেন আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত রং নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে তা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। অহংকারের অন্ধতা থেকে যেন এই দেবদুর্লভ দৃশ্য হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণ্যসংগমের তীরে নিভৃত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি, মিলন-সংগীত এখনও সেখানকার সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে সেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বেজে উঠছে। থাকতে থাকতে শুনতে শুনতে সেই সংগীতে আমরাও যেন কিছু সুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ করো। কেননা জগতে যত সুর বাজে তার মধ্যে এই সুরই সবচেয়ে গভীর সব চেয়ে মিষ্ট। মিলনের আনন্দে মানুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায় এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্ছনা।

৭ই পৌষ, রাত্রি, ১৩১৬

চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়, প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে-কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যুষে প্রভাত এসে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে জাদুকরের মতো জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়। দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্তা এই মুহূর্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই বলছে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরুপ্রান্তরে কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড়ো বড়ো সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে, এ সেই অতিপুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল, সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মতো এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্তি, সদ্যোজাত শিশুর মতোই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনই নবীন হয়ে ওঠে, এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কী? এর মানে হচ্ছে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী। পুরাতনতা জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মতো আসছে যাচ্ছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, একে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা। তারা মরীচিকার মতো, জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তরের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না, প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতিপুরাতন দিন, একে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আসতে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তার পরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধুলার পর ধুলা আবর্জনার পর আবর্জনা কেবলই জমে উঠত। চেষ্টার

ক্ষোভে, অহংকারের তাপে, কর্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলই মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলই কাড়তে যাওয়া, কেবলই ধাক্কা খাওয়া, কেবলই অন্তহীন পথ, কেবলই লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মতো বিদীর্ণ করে ফেলত।

এখনও দিনের বিচিত্র সংগীত তার সমস্ত মূর্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠে নি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠতে থাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে চাইবে। দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার রুদ্ধ গর্জন উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মতো এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরেসুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেমনি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই।. সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর। নিত্যরাগিণীর মূর্তিটি অতি সৌম্য-ভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুনতে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হ'ক না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিসটি হচ্ছে শান্তম্। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেইজন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্তিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইছে কিন্তু রোজ সকাল-বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্ছেন শিবম্। প্রভাতে তাঁর একটি নির্মল মূর্তিকে দেখতে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলিরেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে, বুদ্‌বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনও কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলটপালট হয়ে যাক না তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে, কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্, অন্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম্।

সমুদ্রের ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারের অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের

মুখে একটি মিলনের বার্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুনতে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অদ্বৈতম্। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তারপরে দেখি ছিন্নবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলে নি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্, অন্তে অদ্বৈতম্, অন্তরে অদ্বৈতম্।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুনতে পেয়েছে, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ-কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে এ-কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংস্রব কোনো মতেই ঘুচছে না। এইজন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনও প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনও নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না, আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মূলে ফিরে আসবে, সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে-যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে-যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনোমতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনই প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিচ্ছেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পারবে এত বড়ো শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে। কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি, সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্বলতা। এইজন্যেই অহংকারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগসাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন? না, গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্যন্ত যাক না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করবার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে, কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্তেই তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই, তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এই জন্যে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারংবার পরিস্ফুট করে তুলতে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মতো আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্ছে সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে-স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যতদূরই যাক না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউইয়ের মতোই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে। কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা পতনের দ্বারা ঘটবে, তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে,

> অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কেননা সমস্তের মূলে যিনি আছেন তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে চাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এইজন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভালো করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য—খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁত করে, সমস্ত তারগুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া, এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তমতো সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামতো তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখতে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিনতে এবং

কণ্ঠটিকে সত্য করে তুলতে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহ্যত্ন সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমটি প্রভাতের মতো সরল, নির্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন, ভোগবিলাস ঐশ্বর্য-উপকরণ খ্যাতি-প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকবে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমের কত কাজকর্ম, অর্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়। এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না। আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছোনো, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বলছেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছৃত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে—তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও। প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা

ক'রো না। সকলের চেয়ে বড়ো হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য হয়ে উঠব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ-পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি, তবু বলছি এ পথ তোমার না হ'ক। তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক যেখানে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এসে মিলেছে। তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জন করে তাকে সার্থক করো। যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাকবে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে, এই তোমার সাধনা হ'ক। ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস—দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আসবে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্তে মুহূর্তে এই রকম ঘটছে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আনো আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে; আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেলতে খেলতে মার কাছে বারবার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ংকর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম সংসারের খেলা ভয়ংকর হয়ে উঠবে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখো যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার, দুর্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে। দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আসো, তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে ক'রো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে। আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে, একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখতে দেখতে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই

বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হয়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে। বাঁধা প'ড়ো না এর মধ্যে। ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস। জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতত্ত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখো। তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে, সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। জগতের সমস্ত সংকোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ, এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও; বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্মকে নির্মলরূপে সত্য করে তোলো।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত, তুমি যখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধুলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরানো, ওটা, সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনাআপনি ভরে উঠছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুমকিও খসে নি; আজও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলছে, বলো দেখি আমি তোমার জন্যে কী এনেছি! তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্র-পুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলছে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকে আপনি ধ্বংস করছে—সে যা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনই তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখো—শৈশবের সত্যদৃষ্টি ফিরে আসুক, জলস্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মতো করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করো। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো—কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কী নিবিড়, কী নিগূঢ়, কী আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সংগীতে বেজে উঠছে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন। এই সৌন্দর্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই, চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন, চিরসুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা, সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো, সত্য হ'ক তোমার জীবন তোমার জগৎ, জ্যোতির্ময় হ'ক, অমৃতময় হ'ক।

দেখো, আজ দেখো, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই, কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারিদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মতো আবৃত আবদ্ধ করতে পারছে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্তমহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেদিগন্তে দীপ জ্বলছে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আজ তোমার কিসের সংকোচ। আজ তুমি নিজেকে জানো, সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠো, পুলকিত হয়ে ওঠো। তোমারই আত্মার এই মহোৎসব-সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো একধারে পড়ে থেকো না, যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মতো উঞ্ছবৃত্তি ক'রো না।

হে অন্তরতর, আমাকে বড়ো করে জানাবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘুচিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও। আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য। আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু

তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও। আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধুলায় নত করে দাও যে-ধুলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনোই যেতে দেবে না, ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারংবার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে। দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধুলো জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়, অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হালকা হয়, ধুলার চিহ্ন থাকে না; একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতেই গিয়ে পৌঁছোতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও। তখন কোনো ব্যবধান রাখ না। তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের পথে আবার পাঠিয়ে দাও। নির্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি, মনে গর্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু প্রেমের টান তো ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব নিয়ে তো আত্মার ক্ষুধা মেটে না। শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্‌কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝতে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্বলতা। তখন গর্বকে বিসর্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই। তখনই তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না। সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে—মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্মের ঝংকারে। বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক। শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক। পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক। সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক, জীবনমৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক, অন্তর-বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক, ভূর্ভুবঃস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক। বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ। বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়। তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুর্যকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তাহলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

> সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
> কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
> তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
> যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনায় যারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্ছে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এই জন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছোয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোট হ'ক বড়ো হ'ক, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক, শত্রু হ'ক মিত্র হ'ক সকলেই আমার আপন।

মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খ্রীস্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি, তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই— আরও বড়ো, আরও বড়ো, আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না, সে আপনার বড়োত্বের মধ্যেই

বন্দী। সে-ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্ত স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে-কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।

> যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
> যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
> য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
> তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মতো পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়, নমোনমঃ; তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার; সর্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন যা কিছু উর্ধ্বে আছে অধোতে

আছে, দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী ?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনি অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগৎকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ,

সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্‌বোধনের জন্তেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্তে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়ার মূল্য কী? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই— আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্তই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃধঃ, লোভ ক'রো না।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনাবর্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বলছে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এইসকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উলটো।

যে-লোক আপনাকেই বড়ো করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয়তো নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে-ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম ব'লে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে, তখনই সে বড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু সেই বড়ো হবার মূল্যটি কী? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে খর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্তে, সামাজিক হবার জন্তে, স্বাদেশিক হবার জন্তে

মানুষকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো ক'রে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই খর্ব করতে হয়। তার যে-সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশ-বোধে মানুষ একদিকে যতই বড়ো হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। একেই তো বলে বীতরাগ হওয়া। এই জন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। বলে, মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চেষ্টা। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্ত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌঁছেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে-সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতা-বোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সে জন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্ছে সাত্ত্বিকতার অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্মের চর্চা করা—অন্নজল নদী পর্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা; ধর্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্মের দ্বারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড়ো তার চৈতন্যও তত বড়ো হওয়া চাই, এই জন্যই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্বত্রই এমনতরো সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তো জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্বত্র সর্বদাই এই অনন্তকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ

বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধ-শক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করে নি।

এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে-বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে-লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারই সাধনা প্রচার করবার জন্যে এদেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি,
ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ,
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোটো বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন

কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই, যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদেপদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্বত্র ছড়াতে পায় না। সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না। দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে। যে-বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করছে। দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলছে এবং মানব-ঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল, ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই; যে-মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতো বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, নচেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। ইহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য—প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে-পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই; যে-পরিমাণে না করি সেই

পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্য সকল দেশেই সর্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে, কেননা সেই একই অমৃত, সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে-সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করছে কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে—একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা প্রশস্ত করে নিয়েছে। সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনও তারা ব্যাপ্ত হচ্ছে, তাদের শক্তি এখনও কোথাও তেমন করে অভিহত হয় নি। তারা চলেছে তারা বদ্ধ হয় নি। কিন্তু সেই জন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কী? তারা মনে করছে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম, এর পরে বুঝি আর কিছু নেই, যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করছে, আজকালকার দিনে উন্নতি বলতে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে, এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয় নি।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ

আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলই আঘাত পেতে থাকব,—কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি "সর্বগতঃ শিবঃ," যিনি "সর্বভূতগুহাশয়ঃ" যিনি "সর্বানুভূঃ"। তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল। যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তাহলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ, যিনি এক ; অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই ; বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কী আশ্চর্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়। মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্ছে। মনে হয় যেন

এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মূর্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে— এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি। এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ। এইজন্যে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণ স্তক্মা—প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্ত আয়তে, নমো অস্ত পরায়তে—যে প্রাণ আসছ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্ছ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তা প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আসবে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে, যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রই তুমি। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি সেই জন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন প্রাণো বিরাট্‌। সেই প্রাণকেই তাঁরা সূর্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে—যে প্রাণ ক্রন্দন করছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন করছ সেই তোমাকে নমস্কার। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিদ্যুতে জ্বলে উঠছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়ছ সেই তোমাকে নমস্কার। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন। তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির

মধ্যে রয়েছে। সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে, হে সর্বব্যাপী পরমানন্দ, তোমাকে সর্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ক। যাক সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক। দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক। সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক, শত্রু মিত্র মিলে যাক, স্বদেশ বিদেশ এক হ'ক। হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিদ্র নই। তোমার অমৃতময় অনুভূতি দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা তো কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন প্রেমের সুগন্ধ বসন্তবাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি। বলেছেন রসো বৈ সঃ—সেই জন্যেই জগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানিভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে বিচিত্র করে ভোগ করছি। হে অনির্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখলে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নিচে নত হয়ে পড়ে। বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধুলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও। চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারও চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়, রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্যে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তোমার যে-রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে-রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না ফুরিয়ে যাচ্ছে না—মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায় মাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে, পুত্রে কন্যায়, বন্ধুবান্ধবে নানাদিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে-অমৃত তারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও। তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে

মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি। যারা তোমারই সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরিব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশি হয়ে যে-জায়গাটিতে কারও লোভ নেই সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা। আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তাহলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

গ্রন্থ-পরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

পূরবী

পূরবী ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত, 'পূরবী' ও 'পথিক'[১]। ১৩২৪-১৩৩০ সালে রচিত কবিতা 'পূরবী' অংশে ও ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত কবিতা 'পথিক' অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পথিক অংশের অনেক কবিতার ইতিহাস 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' অংশে সন্নিবদ্ধ আছে।

পথিক অংশের প্রথম কবিতা 'সাবিত্রী' (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রসঙ্গে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশগুলি দ্রষ্টব্য :

হারুনা-মারু জাহাজ
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শান-বাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে ফেলতে চায়, নাগাল পায় না।···

২৫ সেপ্টেম্বর

কাল সমস্তদিন জাহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যখন ছাড়ল তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত কিন্তু তখনো মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না।···

১ পূরবীর প্রথম মুদ্রণে তৃতীয় একটি অংশ ছিল "সঞ্চিতা"—পুরাতন যে-সব কবিতা অন্য কোনো বইতে গ্রথিত হয় নাই সেগুলি এই বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিভাগটি পরিত্যক্ত হয়, রচনাবলীতেও বর্জিত হইল। এই বিভাগে মুদ্রিত কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডের সংযোজনে মুদ্রিত হইয়াছে।

২৬ সেপ্টেম্বর

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। বাদল-রাজের কালো-উর্দিপরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায়, দেখেছি বাপমায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলে-মেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি সূর্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সেদেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরলরৌদ্রের দেশে তারা ঘরে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দা কখনো বা অর্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়, তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয় তো কী। সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন আমাদের রূপরস সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহা জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ওই তেজই মানসভাব ধারণ ক'রে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং এত রূপ এত ভাব এত রস। ওই যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনি আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওংকার-ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে?

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক। বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝরধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ

খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।

২৬ সেপ্টেম্বর

কাল অপরাহ্ণে আচ্ছন্ন সূর্যের উদ্দেশে একটা কবিতা শুরু করেছি, আজ সকালে শেষ হল।

ঘন অশ্রুবাষ্পে ঘেরা মেঘের দুর্যোগে খড়্‌গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।…

"লিপি" (৪ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতা-প্রসঙ্গে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশ পঠনীয় :

৩ অক্টোবর, ১৯২৪
হারুনা-মারু জাহাজ

এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব-আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল :

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে ?

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূরতীরে যে-ধরণী আপনার নানা-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি, সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই; সে-ই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই এক-খানিতেই সব-আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে কণ্ঠের ভিতর দিয়ে রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিঃশ্বসিত, একটি চিঠির সেই একটিমাত্র কথা,—সেই আলো, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা দূর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কী একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দুই ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরল, তখনি সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। বীজ ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনি তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ, এ নইলে সব চুপ সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা একটা আকাঙ্ক্ষার টান টনটন করে উঠল, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এপারে-ওপারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায়; কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে যদি মায়া বল তো দোষ নেই, কেননা এই চিঠি লিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা;—এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন আকাশ-পথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্‌-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে-উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠল, সেই তো মাটির তলায় অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্‌ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইশারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্‌ চোর-কোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছু-দিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে, "এসেছি।"

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি পড়ে বললেন—তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মানুষের চিঠি পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদূতে

বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই লেখায় কোন্‌খানে রূপক কোন্‌খানে সাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে। আমি বললুম—কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে? স্বর্গ-মর্তের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তা-ছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক, কানে-কানেই হোক, মনে-মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে-চিঠি চলে সেও ওই বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

"পূরবী" কবিতাটির পূর্ব পাঠ পলাতকায় "শেষ গান" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "পূরবী" ও "বিজয়ী" ১৩২৪ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, রচনা-তারিখ পাওয়া যায় নাই।

১৩২৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে কলিকাতায় যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটি তথায় পাঠ করেন। ঐ কবিতাটির 'দিয়ে গেলে তোমার সংগীত' (পৃ. ১৩) স্থলে 'দিয়েছ সংগীত তব' এবং 'রেখে গেলে' স্থলে 'রেখে গেছ' পরিবর্তন কবি করিয়াছিলেন; পূরবীর কোনো সংস্করণে এই সংশোধনটি সন্নিবিষ্ট হয় নাই; এই সংশোধন করিয়া কবিতাটি পড়িতে হইবে। কবিকৃত এইরূপ আর-একটি সংশোধন, "আনমনা" কবিতার (পৃ ৬৪) দ্বিতীয় ছত্রে 'মালাখানি' স্থলে 'মাল্যখানি'। "বেঠিক পথের পথিক" কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার সময় এই পাঠনির্দেশ মুদ্রিত ছিল: "এই কবিতাটির অকারান্ত সমস্ত শব্দকে হসন্তরূপে গণ্য করিতে হইবে ও কবিতাটি দাদরা তালে পড়িতে হইবে।" অকারান্ত সব শব্দ হসন্তযোগে মুদ্রিত ছিল।

"তৃতীয়া" ও "বিরহিণী" কবিতা দুইটি কবির পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীর উদ্দেশে রচিত; রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের প্রারম্ভে নন্দিনীর চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সাহায্যে কোনো কোনো কবিতার তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ গ্রন্থপ্রকাশকালে বর্জিত হইয়াছে, নিচে সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

"সাবিত্রী", ষষ্ঠ স্তবক 'চিহ্ন নাহি রাখে'র পর

তোমার উৎসবধারা আসা-যাওয়া দু-কূল ধ্বনিয়া
নিত্য ছুটে যায়।

তোমার নর্তকীদল বিরহমিলন ঝঞ্ঝনিয়া
খঞ্জনী বাজায়।
স্মৃতি-বিস্মৃতির ছন্দ-আন্দোলনে উত্তালছন্দিত
মুক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে নূপুর-মন্দ্রিত,
দুঃখ আর সুখ।
বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্দ্ববেগে ব্যথিত স্পন্দিত,
করে ধুকধুক।

এই ভালো, এই মন্দ, এই দ্বন্দ্ব আঘাতে সংঘাতে
নিক মোরে টেনে।
আলো-আঁধারের দোলে পুনঃপুনঃ আশা-আশঙ্কাতে
যাক মোরে হেনে।
সেই তরঙ্গের ঊর্ধ্বে দিক দেখা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর,
জ্যোতিঃশতদল তব স্থির দীপ্ত আসন বিস্ফুর,
অম্লান-মহিমা।
সব দ্বন্দ্ব মগ্ন করে গন্ধ তার আনন্দের সুর
নাহি তার সীমা।

"মুক্তি", প্রথম স্তবক 'সেথা মোর চিরন্তন শেষ'-এর পর

পথে যেতে যদি কভু সাথি বলে চিনি বিশ্বপতি,
তোমারে কোথাও ;—
প্রভু, যদি কভু তব প্রভুত্বের দাবি মোর প্রতি
ছেড়ে দিতে চাও!
তাহলে আসুক সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধুতটে,
শান্তিবারি পূর্ণ হোক গোধূলির স্বর্ণময় ঘটে ;
শিশুর মতন তুমি এঁকে দাও আকাশের পটে
আনমনে যাহা-তাহা ছবি।
শিশুর মতন বসি একাসনে তোমা সনে কবি।

"দুঃখসম্পদ", 'চিরদিন গোপনে বিরাজে'র পর

যখনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,
তখনি তো জানি, ফুল চিরদিন ছিল তারি চাপে।

দুঃখ চেয়ে আরো বড়ো না থাকিত কিছু
জীবনের প্রতিদিন হত মাথা নিচু,
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রূপহাস্তে আনিত চরম অসম্মান।

"কিশোর প্রেম", তৃতীয় স্তবক 'অজানা কোন্ ভাষা'র পর

তার পরে সেই তীরে বসে কত কাঁদন কাঁদা।
ওপার পানে যাবার লাগি
আঁধার রাতে ছিলাম জাগি,
কে জানিত তটচ্ছায়ায় তরী ছিল বাঁধা,
মিছে কত কাঁদন কাঁদা।

"আনমনা" ও "বদল" কবিতা দুইটির গীত-রূপ প্রথম সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে দ্রষ্টব্য। গান দুইটির প্রথম ছত্র যথাক্রমে "আনমনা, আনমনা" ও "তার হাতে ছিল হাসির ফুলের ভার"।

লেখন

লেখন ১৩৩৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৩৫) যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা নিচে মুদ্রিত হইল।

লেখন

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে একদিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি

করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে—সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নাম্নে সুখমস্তি—নাট্য সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় করে বলেছি :

আমার লিখন ফুটে পথধারে
    ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
    চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে-জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়োফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।

গেলবারে যখন ইটালিতে গিয়েছিলুম, তখন স্বাক্ষরলিপির খাতায় অনেক লিখতে হয়েছিল। লেখা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল ইংরেজি লেখারই দাবি। এবারেও লিখতে লিখতে কতক তাঁদের খাতায় কতক আমার নিজের খাতায় অনেকগুলি ওইরকম ছোটো ছোটো লেখা জমা হয়ে উঠল। এইরকম অনেক সময়ই অনুরোধের খাতিরে লেখা শুরু হয়, তার পরে ঝোঁক চেপে গেলে আর অনুরোধের দরকার থাকে না।

জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি এল্যুমিনিয়ম পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বসলুম।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমার কোনো তরুণ বন্ধু বললেন, "আপনার কিছুকাল পূর্বেকার লেখা কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা আছে। সেইগুলিকে এই উপলক্ষে যাতে রক্ষা করা হয় এই আমার একান্ত অনুরোধ।"

আমার ভোলবার শক্তি অসামান্য এবং নিজের পূর্বের লেখার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহেতুক বিরাগ জন্মায়। এইজন্যই তরুণ লেখকরা সাহিত্যিক-পদবী থেকে আমাকে যখন বরখাস্ত করবার জন্যে কানাকানি করতে থাকেন তখন আমার মন আমাকে পরামর্শ দেয় যে, "আগেভাগে নিজেই তুমি মানে মানে রেজিগনেশন-পত্র পাঠিয়ে যৎসামান্য কিছু পেনসনের দাবি রেখে দাও।" এটা যে সম্ভব হয় তার কারণ আমার পূর্বেকার লেখাগুলো আমি যে-পরিমাণে ভুলি সেই পরিমাণেই মনে হয় তারা ভোলবারই যোগ্য।

তাই প্রস্তুত হয়েছিলেম, আমার বন্ধু পুরোনো ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে উঞ্ছস্বরূপ যা-কিছু সংগ্রহ করে আনবেন আবার তাদেরকে পুরোনোর তমিস্রলোকে বৈতরণী পার করে ফেরত পাঠাব।

গুটিপাঁচেক ছোটো কবিতা তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আমি বললেম, "কিছুতেই মনে পড়বে না এগুলি আমার লেখা," তিনি জোর করেই বললেন, "কোনো সংশয় নেই।"

আমার রচনা-সম্বন্ধে আমার নিজের সাক্ষ্যকে সর্বদাই অবজ্ঞা করা হয়। আমার গানে আমি সুর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সদ্যোজাত সুর শিখিয়ে দিই। তখন থেকে সে-গানের সুরগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্রের। তার পর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ-কথা বলতে সংকোচমাত্র করে না যে, আমি ভুল করছি। এ-সম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বারবার স্বীকার করে নিতে হয়।

কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলেম। পড়ে বিশেষ তৃপ্তি

বোধ হল—মনে হল ভালোই লিখেছি। বিস্মরণশক্তির প্রবলতাবশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না—কেননা তার সম্বন্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হয়ে যায়। পড়ে দেখলাম :

তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি,
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ঋণী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটোর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত—এমন কি, একে বড়ো আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

তার পরে আর-একটা কবিতা :

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে,
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে।
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে—
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম, শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে এ-কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজন্যে নিজেকে মনে মনে বলতে হল ধন্য।

তার পরে আর-একটি কবিতা :

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি? পূর্ণ নাম ধরে

আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সময়
পরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী পথচিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে—সে আজকের কথা নয়—এই ভাবের দুই-একটা কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তনু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আর-একটি ছোটো কবিতা :

প্রভু, তুমি দিয়েছ যে-ভার
যদি তাহা মাথা হতে   এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বার বার
জেনো তা বিদ্রোহ নয়,   ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরান আমার।

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলটির মতো ফুটে উঠেছে।

আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা কয়টি এল্যুমিনিয়মের পাতের উপর স্বহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার লেখন নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।

আজ প্রায় মাসখানেক পূর্বে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে 'লেখন' এক-খণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। তিনি যে-পত্র লিখেছেন সেটা উদ্ধৃত করে দিই :

লেখন পড়লাম। এর কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতা বড়ো চমৎকার—দু-চার ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন এক-একটি সু-সংস্কৃত মণি, আলো ঠিকরে পড়ছে। লেখনে দেখলাম ২৩এর পৃষ্ঠায় আমার চারটি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, আর একটির প্রথম দু লাইন। যথা

১। তোমারে ভুলিতে মোর হল নাকো মতি
২। ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে
৩। আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন
৪। প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার
৫। শুধু এইটুকু সুখ অতি সুকুমার (প্রথম দু লাইন।)[১]

[১] এই পাঁচটি কবিতাই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বর্জিত হইয়াছে। পঞ্চম কবিতাটির অবশিষ্ট দুই ছত্র :

স্থির হয়ে সহ্য করো পরিপূর্ণ ক্ষতি,
শেষটুকু নিয়ে যাক নিষ্ঠুর নিয়তি।

সবগুলিই 'পত্রলেখা'য় ছাপা হয়ে গিয়েছে, ১৯০৮ সালে। তবে এ নিয়ে আর কাউকে যেন কিছু বলবেন না।

তখন আমার মনে পড়ল যখন 'পত্রলেখা'র পাণ্ডুলিপি প্রথম আমি পড়ে দেখি তখন প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতায় আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি। বোধ করি, সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সম্মান লাভ করে নি। অন্তত 'পত্রলেখা'র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষরে আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে পেরেছি বলে খুশি হলেম।

এই প্রসঙ্গে এ-কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে "এই লেখনগুলি শুরু" "চীনে জাপানে" হয় নাই, চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে "স্বাক্ষরলিপির দাবি" মিটাইতে হইয়াছে, এবং লেখনের সব কবিতাই এইরূপ দাবি মিটাইবার জন্য রচিত নহে; ১৮০ পৃষ্ঠার 'একা একা শূন্য মাত্র নাহি অবলম্ব' হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১৩ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজ, আরোগ্যশালা প্রভৃতি নানাস্থানে রচিত। এই কবিতাগুচ্ছ 'দ্বিপদী' নামে ১৩২০ সালের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

লেখন আদ্যোপান্ত কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার নিদর্শনমাত্রস্বরূপ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, ভূমিকা, প্রথম পৃষ্ঠা, ও শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি রচনাবলী সংস্করণে মুদ্রিত হইল। লেখনে ইংরেজি কবিতাও মুদ্রিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে লেখনের প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১৩২৯ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের প্রবাসীতে নাটকটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে (২১ বৈশাখ, ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আমি 'মুক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের

একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, "আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে "মার লাগিয়ে জয়ী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।…

'মুক্তধারা'র পূর্বকল্পিত নাম ছিল 'পথ'; শ্রীমতী রানু অধিকারীকে একটি চিঠিতে (৪ মাঘ ১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম—শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।[১]

গল্পগুচ্ছ

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড হইতে গল্পগুচ্ছ, সাময়িক পত্রে প্রকাশকালের অনুক্রম যতদূর জানা যায়, তদনুসারে, মুদ্রণ আরম্ভ হইল।

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া গেল:

ঘাটের কথা	কার্তিক ১২৯১, ভারতী
রাজপথের কথা	অগ্রহায়ণ ১২৯১, নবজীবন
মুকুট	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, বালক

১ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৪৩

"ঘাটের কথা" ও "রাজপথের কথা" সর্বপ্রথম 'ছোট গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। "মুকুট" 'ছুটির পড়া' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। মুকুটের নাট্যরূপ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয় :

ছোট গল্প। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০

বিচিত্র গল্প, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ। ১৩০১

কথা-চতুষ্টয়। ১৩০১

গল্প-দশক। ১৩০২

গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড।[১] ১৩০৭

গল্প (গল্পগুচ্ছ) ২য় খণ্ড। ১৩০৭

কর্মফল। ১৩১০

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।[২] হিতবাদীর উপহার। ১৩১১

আটটি গল্প [৩] [২০ নবেম্বর ১৯১১]

গল্প চারিটি [১৮ মার্চ ১৯১২]

গল্পসপ্তক [১৩২৩]

পয়লা নম্বর। ১৩২৭

তিন সঙ্গী। পৌষ ১৩৪৭

এই সংগ্রহের কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটো গল্প সংগৃহীত হয় নাই। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত গল্পগুচ্ছেই সর্বাপেক্ষা অধিক গল্প আছে। তৃতীয় খণ্ডের শেষ সংস্করণে 'গল্পসপ্তকে'র পরবর্তী এবং 'তিন সঙ্গী'র পূর্ববর্তী গল্প, যেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই, সেগুলিও সংকলিত হইয়াছে; 'তিন সঙ্গী' প্রকাশিত হইবার পর ইহার নূতন সংস্করণ হয় নাই। 'তিন সঙ্গী' প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল গল্প বা গল্পের খসড়া লিখিয়াছিলেন সেগুলি এখনো কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পগুচ্ছ পর্যায়ে এই সব গল্পই ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।

১ ১৯০৮-৯ সালে ইণ্ডিয়ান প্রেস ছোট গল্পের সংগ্রহ গল্পগুচ্ছ পাঁচ ভাগে প্রকাশ করেন। ১৩২৩ সালে তিন ভাগে বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হয়।

২ এই গ্রন্থাবলীর 'সংসার চিত্র', 'সমাজ চিত্র', 'রঙ্গচিত্র' ও 'বিচিত্র চিত্র' বিভাগে ছোট গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩ বালকপাঠ্য গল্পের সংকলন।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্রের ভারতীতে প্রকাশিত "ভিখারিণী" গল্প সাময়িক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটো গল্প বলিয়া অনুমিত। কোনো পুস্তকে এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এই জন্য রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পগুচ্ছের মূল পর্যায় হইতে এটি পরিত্যক্ত হইল। অন্যান্য বর্জিত রচনার সহিত এটি মুদ্রিত হইবে।

উপরে যে-সকল গল্পসংগ্রহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপের গল্প স্থান পাইয়াছে; এগুলি রচনাবলীতে 'উপন্যাস ও গল্প' বিভাগে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু 'গল্পগুচ্ছ' পর্যায়ে নহে।

লিপিকা। ১৯২২

সে। বৈশাখ ১৩৪৪

গল্পসল্প। বৈশাখ ১৩৪৮

স্বরচিত ছোটো গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে-সকল উল্লেখ ও মন্তব্য করিয়াছেন নিচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পুরে
সংগীতের মুষলধারায়,
পরানের বহুদূর কূলে কূলে ভরপুর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়।
তখন সে পুঁথি ফেলি দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘদিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে,—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতি বৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ-নিশার।

—"বর্ষাযাপন", 'সোনার তরী'

সাজাদপুর ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩

…আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-একসময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। 'মিউজ'দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়… —ছিন্নপত্র

শিলাইদা ২৭ জুন ১৮৯৪

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপ থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যাহোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি

আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল— তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক তবু সে মনের মধ্যে আছে।···আমি ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে—নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি।··· —ছিন্নপত্র

বোলপুর ২৮ ভাদ্র ১৩১৭

···সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোটো গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।···সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।···

—শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র[১]

[চৈত্র ১৩৪৭]

···আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'আত্মপরিচয়', পরিশিষ্ট

তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল।...একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না। তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় একসময় গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।...

—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র[১]

মে ১৯৪১]

...অসংখ্য ছোটো ছোটো লীরিক লিখেছি—বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি—কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে-নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে হয়তো খানিকটা বলতে পার, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন "কাব্যের উপেক্ষিতা", "কেকাধ্বনি", এ-সব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব

১ দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', "সাহিত্যবিচার"; 'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৮

বেশি ছিল, ও-সব যেন অনেকটা গল্প-পল্প গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে-সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। বঙ্কিম যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' লিখেছিলেন, সে-সব কি সত্যি ছিল? সে-সব romantic situation কি তখন ঘটতে পারত? সত্যি হচ্ছে এই যে, তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি রোমান্স, পড়ে ভালো লেগেছিল। তৃপ্তির একটা ক্ষেত্র তো চাই। বঙ্কিম পেয়েছিলেন সে ক্ষেত্র, আমাদের দিয়েছিলেন। আমি তাই বলি, বঙ্কিমের রচনায় আমরা যা পাই তা সামন্ত-তন্ত্র নয়। তাকে নতুন একটা পিপাসা বলতে পার, যা মেটাবার রস তিনি যেখান থেকে হোক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বইগুলোতে যে-সব কাণ্ডকারখানা আছে, সেগুলো তাঁর স্মৃতির মধ্যেও ছিল না। আর মজা এই, আমাদের তা ভালোও লেগেছে, কারণ এ স্বাদ আমরা আগে কখনো পাই নি। নিন্দে করতে পারব না বঙ্কিমকে, নিশ্চয়ই বলব তিনি ও-রসের জোগান দিয়েছিলেন বলেই বেঁচে গিয়েছিলুম। কী dull সমাজ ছিল তখন। তারই মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি এ-সব রাজার লড়াই ইত্যাদি আমাদের গরিবের মনে একটা উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। বিদেশ থেকে আমদানি ব'লে একে আমি ছোটো করছি না। এতে সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ ওদের যে-সাহিত্য আমাদের দেশে আনলে, তা আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে এও সত্য যে, বাংলাদেশে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল,—আমাদের মনটাই সাহিত্যিক। য়ুরোপীয় কালচার ঠিক জায়গা পেয়েছিল আমাদের মধ্যে। সোনার ফসল ফলল ইংরেজ আসার দরুন নয়, আমরা ওদের সাহিত্য পেয়েছিলুম ব'লে। ইংরেজ না হয়ে ফরাসি যদি হত আজ আমরা সব মোপাসাঁ হয়ে উঠতুম। আমরা ব্যাকুল হয়ে ছিলুম, তাই পাওয়ামাত্র আগ্রহভরে নিয়েছি।

বঙ্কিমের গল্প এখন হয়তো তোমাদের কাছে আজগুবি ঠেকে, কিন্তু আমরা তাতে যে নতুন রস পেয়েছিলুম, তা ভুলতে পারি নে। এখন তোমরা বল তোমাদের সমাজেই সব আছে, গল্পের সব উপাদানই পাও তা থেকে। কিন্তু এখনকার সুখ দুঃখ ভালোবাসা কি তখন ছিল না? তখনও ছিল, চোখে পড়ে নি। আবরণ রচনা করেছিল বিদেশী রোমান্স।... —শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি[১]

১ দ্রষ্টব্য : "সাহিত্য, গান, ছবি", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

[২৪ মে ১৯৪১]

…আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তাঁর মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাতপ্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।… —শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র [১]

উত্তরায়ণ, ৯ জুন ১৯৪১

আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি, এই দুঃখ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের 'পরিচয়ে'[২] এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না।…—শ্রীহিরণকুমার সান্যালকে লিখিত পত্র

শান্তিনিকেতন

বর্তমান খণ্ডে শান্তিনিকেতন ৪-১০ খণ্ড প্রকাশিত হইল। রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ডে শান্তিনিকেতন ১১-১২ এবং ষোড়শ খণ্ডে ১৩-১৭ প্রকাশিত হইবে ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থপর্যায় সমাপ্ত হইবে।

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা" ; 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৮

২ দ্রষ্টব্য : পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, "গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ"

বর্ণানুক্রমিক সূচী